

# বৈশাখি ২০০৩



রাজামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ  
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাজামাটি



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

# বৈসাৰি

বিৰু - সাংগ্ৰাই - বৈসুক' ২০০৩



ৰাজামাটি পাৰ্বত্য জেলা পৰিষদ  
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট  
ৰাজামাটি ।

প্রকাশনায়  
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট  
রাজশাহী ।

প্রকাশকাল  
রাজশাহী, এপ্রিল- ২০০৩ ইং

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে  
অনুশীলন  
ত্রিদিব নগর,  
বনরূপা, রাজশাহী ।

প্রচ্ছদ  
প্রকৌশলী মোহন চাকমা  
ও  
প্রদীপ কুমার দে

গুণেচ্ছা মূল্য  
১০০ টাকা মাত্র ।

## শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতীয়দের মধ্যে পুরাতন বর্ষের শেষে ও নববর্ষের সময় তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসব চাকমাদের মাঝে বিঝু, তঞ্চঙ্গ্যাদের মাঝে বিসু, মারমাদের মাঝে সাংগ্রাই এবং ত্রিপুরাদের মাঝে বৈসুক নামে পরিচিত। এ মহতি উৎসবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আরণ্য জনপদ হাসি-গানে, আনন্দে ও সঙ্গীতে মুখরিত ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। পুরাতন বর্ষের সাথে সাথে যেন পুরাতন দিনের দুঃখ-কষ্টগুলিও সবার জীবন থেকে দূর হয়ে যায়, সেই কামনা করি।

সেই সাথে এবারের বিঝু, বিসু, বৈসুক এবং সাংগ্রাই উৎসবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের জীবন সুখ, আনন্দ এবং সাফল্যে ভরে উঠুক এই কামনা করি এবং সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সেই সাথে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'বৈসাবি ২০০৩' সংকলনের সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।



( মনি স্বপন দেওয়ান )

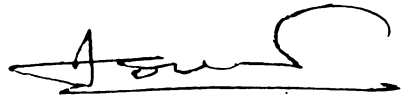
উপমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## গুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন এখন সমাগত। আর কিছুদিন পরেই তাদের প্রধান উৎসব হিসেবে চাকমারা- বিঝু, তঞ্চঙ্গ্যারা- বিসু, মারমারা- সাংখাই এবং ত্রিপুরারা- বৈসুক উদযাপন করতে চলেছে। এ সময় তারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়ে নববর্ষকে বরণ করতে যাচ্ছে। উপজাতীয়দের বিশ্বাস, পুরাতন বর্ষের সাথে সাথে তাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে আর নববর্ষ তাদের জন্য সুখ, আনন্দ ও সমৃদ্ধি বহন করে আনবে; তাদের সে আশা যেন পূর্ণ হয়, এ কামনাই আমি করি।

সেই সাথে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য, উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করে সবাইকে প্রীতি ও গুভেচ্ছা জানাই।



( ড. মানিক লাল দেওয়ান )

চেয়ারম্যান

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

রাঙ্গামাটি।

## শুভেচ্ছা বাণী

পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে আবহমান  
কাল থেকে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়  
জনগণের মধ্যে চাকমারা- বিষ্ণু, তঞ্চঙ্গ্যারা- বিসু, মারমারা- সাংখাই ও ত্রিপুরারা-  
বৈসুক উৎসব পালন করে আসছে। উপজাতিদের পুরাতন বর্ষ বিদায় এবং নতুন বর্ষ  
বরণ সাফল্য মন্ডিত হোক। প্রতিটি ঘরে বয়ে আনুক সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দের বার্তা  
এই কামনাই করি।

সেই সাথে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।



( সুজিত দেওয়ান )

আহ্বায়ক

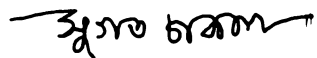
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

## সম্পাদকীয়

বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ উৎসব চাকমাদের বিষ্ণু, মারমাদের সাংগ্রাই, তঞ্চঙ্গ্যাদের বিসু ও ত্রিপুরাদের বৈসুক উপলক্ষে এবারও রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে “বৈসাবি ২০০৩” নামে সংকলন প্রকাশ করা হলো। এতে ঐ উৎসবে উপজাতীয়রা যে সকল আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে সে সকল বিষয়ক কবিতা, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি যেমন রয়েছে আবার ঐ উৎসবকে ঘিরে তাদের কিছু স্মৃতিকথা এবং সেই সাথে রূপকথাও রয়েছে। এগুলি হয়তো কোন কোন পাঠকের কৌতূহলী চিত্তকে আনন্দ দান করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এবারের সংকলনটির জন্য আমরা অনেক লেখা পেয়েছি। সবার লেখা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে আপাতত এ সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। তবে যাঁরা যাঁরা লেখা দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের হাতে ভবিষ্যতে প্রকাশযোগ্য যে সকল অপ্রকাশিত মানসম্পন্ন লেখা রয়েছে নিঃসন্দেহে এগুলিরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ জন্যও এ সকল লেখার লেখকদেরকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সেই সাথে সবাইকে বিষ্ণু, বিসু, সাংগ্রাই, বৈসুক/ ২০০৩ -এর শুভেচ্ছা জানাই। আর নববর্ষ সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা করি।



( সুগত চাকমা )

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাঙ্গামাটি।



## সূচি পত্র

### ক্রমিক নং

### পৃষ্ঠা নং

১। বিঝু পাখীর ডাকে, বৈসাৰি আসে	- মুজিবুল হক বুলবুল	১১
২। চাকমা গান- এল বিঝু	- রিপন চাকমা	১৫
৩। রাধামন-ধনপুদি ব্যালাডে কিশোরী ধনপুদির এক বিঝু দিনের কাহিনী	- সুগত চাকমা	১৭
৪। চাকমা গান- ও নাগুরী ও গাবুরী	- প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা	২৭
৫। সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি	- রমনী মোহন চাকমা	২৯
৬। ত্রিপুরা গান- ও মইন কুচুক্নি বুরুইমা	- সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	৩৩
৭। ত্রিপুরা পল্লীতে বৈসুক উদযাপন	- মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	৩৫
৮। চাকমা রূপকথাঃ গুঅ চেল্যাবলী	- কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা	৩৮
৯। কবিতাঃ অরণ্য পাহাড় নদীর মায়ায়	- মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া	৪৫
১০। আমার জানা বিউ পরব	- হীরারানী বড়ুয়া	৪৬
১১। ভালবেসে ফিরে যাবো	- শ্যামল তালুকদার	৫১
১২। ত্রিপুরা রূপকথা : গুমচাক্ জোক্‌মা	- সুরজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা	৫৩
১৩। তঞ্চঙ্গ্যা গান : নআ চানান	- ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	৭২
১৪। চাকমা বারমাসীর উদ্ভব ও বিকাশের ধারায়ঃ মা বাব' বারমাস	- আর্যামিত্র চাকমা	৭৩
১৫। চাকমা কবিতা : যেন ফিরি এযঙ	- আংছাইন চাক	৮৬
১৬। উদাসী মন	- পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা	৮৮
১৭। কবিতাঃ মাইসীর স্বপ্ন	- শোভা ত্রিপুরা	৮৯
১৮। ত্রিপুরা জনজীবনে তাদের বর্ষপঞ্জি ত্রিপুরাদের প্রভাব	- প্রভাংশু ত্রিপুরা	৯০

# বিবু পাখীর ডাকে, বৈসাবি আসে

মুজিবুল হক বুলবুল

পার্বত্য অঞ্চলের শান্ত চির হরিৎ জনপদে বছরের তিনটি দিন হঠাৎ করেই যেন প্রতিটি মানুষকে আনন্দ-উল্লাস, হৃদয়ের বন্ধন, জীবনের হিসেব নিকেশ, পিছনে ফিরে তাকানো আর আগামি দিনের স্বপ্ন বুননের মাধ্যমে সচকিত করে তোলে। আর এই সোনালি দিনটির নাম 'বৈসাবি'। বৈসাবি পার্বত্য অঞ্চলের সার্বজনীন আনন্দের একমাত্র প্রতীক। সামাজিক আর ধর্মীয় মিশ্রণে সিক্ত এক আনন্দ উৎসব। পাহাড়ের গভীর আর অরণ্যের কাছাকাছি টংঘরে থাকা গরীব পরিবারটি থেকে রাঙ্গামাটি শহরের উচ্চ বিত্ত পরিবারের মধ্যে বৈসাবি পালনের ঔৎসুক্য একই - আয়োজনের প্রাচুর্যে আছে ব্যবধান। বছরের প্রথম দিক থেকেই আগ্রহভরে সবাই অপেক্ষা করে বৈসাবির জন্য। কখন বৈসাবি আসবে! কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বিবু পাখী জানান দিয়ে যায়- বিবু বিবু বিবু। সচেতন হয়ে যায় গহীন অরণ্যের নিরক্ষর পরিবারটিও। বিবু যে এসে গেলো! বিবু পাখী সম্পর্কে চারণ কবি চাকমা গানের সুরে বলে,

দগরে পেকুয়া চিং চিং চিং

চিং চিং চিং

বঝর মাখাত ইকুয়া দিন

ভাংগি পোজ্যোগি বিবু দিন।

বাংলা ভাষায় বলা যায়-

পাখীটি ডাকে কিচির মিচির

বছরের প্রথমে একটি দিন

ভেংগে পড়ছে আনন্দের দিন।।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বউ কথা কও, আঞ্চলিক ভাষায় পাখীর ডাক অনুসরণ করে কাঁঠাল পাক; অথবা কুটুম্ব পাখীর স্বরে আমরা যেমন অতিথি আসার সংবাদ পাই তেমনি পার্বত্য অঞ্চলেও বিবু পাখীর ডাকে উপজাতীয় জনপদে বৈসাবি আসার সংবাদে সবাইকে উল্লসিত করে তোলে- পার্বণের প্রস্তুতিতে সচকিত হয় সবাই। আমাদের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিতে পাখীদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই

অঞ্চলের বৈসাৰি উৎসবে বিষ্ণু পাখীৰ উপস্থিতি শুভ আগমন হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে। যেমন বসন্তে কোকিলের কুলুতান ছাড়া বসন্তের আমেজ থেকে যায় অপূৰ্ণ।

যখন আম্রমুকুলগুলি পূৰ্ণতা লাভ করে- থোকায থোকায কচি আমের মদির নেশায় মৌ মৌ গন্ধ ছড়ায়, কাঁঠাল গাছে গাছে কচি কাঁঠাল বাতাসে দোল খায়, পাখীদের কিচির মিচির শব্দ আর মৌমাছীদের ব্যস্ততা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে আনন্দের বান জাগাতে আসে বৈসাৰি। বাংলা বছরের শেষ দু'দিন আর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে ঘিরে চলে বৈসাৰি উৎসব। পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্ৰিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে স্বাগত জানাতে যথাক্রমে- বিষ্ণু, সাংখ্ৰাই, বৈসুক ও বিষ্ণু উৎসব পালন করে থাকেন। উল্লেখিত প্রত্যেক উপজাতির প্রধান উৎসবের নামের আদ্যাক্ষরের সমন্বয়ে উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে- বৈসাৰি। বৈসাৰি নামের মাধ্যমেও পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ভারতের আসাম, মিয়ানমার, লাওস এবং থাইল্যান্ডে। আর বাঙালী জীবন ধারায় বাংলা নববর্ষের উৎসব আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈসাৰির প্রথম দিনটিকে চাকমা 'ফুল বিষ্ণু', দ্বিতীয় দিনকে 'মূল বিষ্ণু' ও নববর্ষের প্রথম দিনকে 'নুয়াবঝর' বা 'গোজ্যাগোজ্যা' নামে অভিহিত করে থাকেন। অন্যদিকে ত্ৰিপুরা সম্প্রদায় উৎসবের প্রথম দিনটিকে 'হারি বুইসুক; বৈসাৰির দ্বিতীয় দিনকে বলে 'বৈসুকমা' ও নববর্ষের প্রথম দিনটিকে 'বিসিকাতাল' নামে সম্বোধন করে থাকেন। পার্বত্য অঞ্চলের মারমা উপজাতি বিষ্ণুর প্রথম দিনকে 'পাইংছোয়াই'; দ্বিতীয় দিনকে 'সাংখ্ৰাই আক্যা; ও তৃতীয় দিনকে সাংখ্ৰাই আপ্যাইং নামে সম্বোধন করে থাকেন। চাকমা উপজাতির ঘরে ঘরে বিষ্ণু আসে আনন্দ নিয়ে। প্রথম ফুল বিষ্ণুর দিনে ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়ে থাকে। তাছাড়া নদীতে ফুল ভাসিয়ে দিতেও দেখা যায়। সন্ধ্যায় শিশুরা ঘরে ও ঘরের প্রাঙ্গনে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘিলা খেলার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিন মূল বিষ্ণু। এ দিন চাকমাদের ঘরে অতিথিদের জন্য আপ্যায়নের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দলবদ্ধভাবে শিশু-তরুণ-তরুণীরা 'পাজোন' বা বহু সবজি দ্বারা প্রস্তুত তরকারী 'পাঁচন' বা 'নিরামিষ' পিঠা, মিষ্টি, ফল খায় এবং সম্মিলিতভাবে আনন্দ-উপভোগ করেন। উল্লেখ্য যে, পাজোন প্রস্তুতে কয়েক প্রকার সবজির সমন্বয় করা হয়ে থাকে। নববর্ষের প্রথম দিনকে চাকমা

‘নুয়াবঝর’ বা ‘গোজ্যাপোজ্যা’ বলে থাকেন। নুয়াবঝর অর্থ নতুন বছর। আর গোজ্যাপোজ্যা মানে ক্লান্তির পর বিশ্রামের জন্য গড়াগড়ি দেয়া।

ত্রিপুরা ও মারমা উপজাতির লোকেরাও একইভাবে অত্যন্ত আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে বৈসাবি উদযাপন করেন এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায় কারায়া- গরয়া দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ক্যাং- এ বুদ্ধ পূজার আয়োজন করে থাকেন। ত্রিপুরা উপজাতির গড়ায়া নৃত্যও এ সময়ের একটি আনন্দদায়ক নৃত্য। রাখাইন সম্প্রদায় বৈসাবিতে অত্যন্ত উৎসাহের মধ্যে “পানি খেলা” বা “সাইংক্রাইং বোয়ে”-র আয়োজন করে থাকেন। পুরানো বছরের পঙ্কিলতা ধুয়ে ফেলে নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানানোই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

বৈসাবির আনন্দ উৎসবে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কেউ কেউ পানীয় ‘কানজি, জগরা’ (এ অঞ্চলের উৎপাদিত বিশেষভাবে উৎপাদিত মদ) পান করে উৎসবের আনন্দ ধারায় সিক্ত হয়। পূজা, গড়ায়া নৃত্য, আপ্যায়ন, পবিত্রতা, পানি খেলা, খিলা খেলা, নদীতে ফুল ভাসানো, ঘরবাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, নতুন কাপড় চোপড় পরিধান সহ পুরানো বছরকে বিদায় আর নববর্ষকে বরণ করার তিন দিনের ব্যস্ত কর্মসূচীতে পার্বত্য অঞ্চলে সত্যিই নেমে আসে আনন্দ আর শান্তির শুভ বার্তা। ঈদের মতো সার্বজনীন আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যায় বৈসাবিতে। ইদানিং অবশ্য বৈসাবিতে খাদ্য তালিকায়ও আধুনিক খাবারের সংযোজন বেশ লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, বিশ্বায়নের এই যুগে সব কিছুতেই আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। তাই বৈসাবির খাদ্য তালিকায়ও ঐতিহ্যমন্ডিত খাবারের পাশাপাশি কোক, নুডলসসহ বিভিন্ন মিষ্টিজাতীয় খাদ্য এবং আধুনিক খাবার স্থান করে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। মূলত বৈসাবি ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান নয়। সামাজিক এই উৎসবে কিছুটা ধর্মীয় অনুভূতির নির্যাস মিশে গেছে কালস্রোতে। তাই পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী বাঙালী সবাই উৎসবের আনন্দকে সমানভাবে উপভোগ করার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে থাকেন। আর তখন মনে হয় প্রতিদিন যেন বৈসাবির দিন হয়। একই ভাবে যেন ডেকে যায় বিঝু পাখী- বিঝু বিঝু সুরে।

বৈসাবির এই শুভ লগ্নে মনে পড়ছে, আমার প্রিয়জন স্বর্গীয় সুরেন্দ্র লাল  
ত্রিপুরার গানের কয়েকটি পংক্তি-

অ- আনি আচাই মানি হা

ও বাংলাদেশ

অ- আনি আমায়ৈ ।

আনি জীবন ধন্য অংখা

নিনি হাগো ওজিয়ে মায়ৈ

আনে আমা য়ৈ ।

ও আমার জন্মভূমি

ও বাংলাদেশ ।

আমার বাংলা মা ।

আমার জীবন ধন্য হল

তোমার কোলে জন্ম নিয়ে মা-গো ।

আমার বাংলা মা ।

বৈসাবি আবার আনন্দ আর শান্তির স্পর্শ নিয়ে আসবে পার্বত্য অঞ্চলের সকল  
জনপদে এই শুভ কামনা সকলের ।

---

তথ্যসূত্রঃ- জনাব মুজিবুল হক বুলবুল, জেলা কালচারাল অফিসার, বাংলাদেশ শিল্পকলা  
একাডেমী, রাঙ্গামাটি ।

# আমার প্রিয় গান – এল বিঝ

রিপন চাকমা

সুরকার- মনোজ বাহাদুর

ভালক আঝা আর সাগর সবন

পুরন ছারিনেই নুয় জীবন

এহ্লে এহ্লে ফুলে ফুলে

এল বিঝু এল বিঝু ।।

পুরন দিন' ছয়া ভাজি যিয়ে, নুয় দিন' পহর দেগা দিয়ে

দুক ধোই দিল কুঝি পহর, বিঝু পজ্জন ক'ল সুগ দিনর

ছদরক ফুলে ফুলে পেঙ্কুন' গীদে গীদে

আমামায় এল কায়, এল বিঝু এল বিঝু ।।

এঝ সুখ তোগে লোই বিঝুমায়, বিলেই দিবার বেগ' কায়

গাঝে গাঝে ফুলে ফুলে, গাঙে গাঙে ছরামায় ।

জীবন ভরি থোক বানাহ্ খুজি, বুক ভরা আঝা আর মুয়ত হাঝি

সুগ গাং বোই যোক হামিজা, দুগ' বালুচর থোক ভিজা

ভঙরার গীদে গীদে ফুলে ফুলে তুমবাবে

এল বিঝু এল বিঝু ।

## বাংলা অনুবাদ :- এল' বিঝু

অনেক আশা আর অনেক স্বপন  
পুরান ছেড়ে এই নতুন জীবন  
সবুজে শ্যামলে ফুলে ফুলে  
এল বিঝু এল বিঝু ।

পুরানো দিনের কুয়াশা ভেসে গেছে নতুন দিনের আলো দেখা গেছে  
দুখ ধুয়ে দিল নবীন সে কর বিঝু রূপকথা বলে সুখের দিনের  
ছদরক ফুলে ফুলে পাখিদের গীতে গীতে  
আমাদের সবার কাছে এল বিঝু এল বিঝু । ।

এ জীবন ভরে থাক খুশীতে বুক ভরা আশা আর হাসিতে  
সুখনদী বহে যাক হামেশা দুখভরা বালুচর থাক সে ভিজা  
ভ্রমরার গীতে গীতে ফুলে ফুলে সুবাসেতে এল বিঝু এল বিঝু । ।

[ অনুবাদ- সুগত চাকমা, ছদরক- পাহাড়ী গাঁদা ফুল ]

# রাধামন- ধনপুদি ব্যালাডে কিশোরী ধনপুদির এক বিষ্ণু দিনের কাহিনী

সুগত চাকমা

চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যালাডের নাম রাধামন-ধনপুদি। এতে রাধামন এবং ধনপুদি নামক দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার অনবদ্য প্রেমের কাহিনী রয়েছে। এ জাতীয় ব্যালাড চাকমাদের “উভাগীত” -এর সুরে যে চারণকবিরা গ্রাম দেশে গেয়ে শ্রোতাদের চিত্তকে আনন্দে আপ্ত ও উদ্বেলিত করে তোলে তাদেরকে ‘গেংগুলি’ বা ‘গেংখুলি’ বলে। গেংগুলিদের এ ঐতিহ্যবাহী ব্যালাড বা পালাগানে চাকমাদের আদি নিবাসের নাম পাওয়া যায় চম্পকনগর। সেখানে ফুগংতলী-দ্য-মুরাহ্ নামক এক সুউচ্চ পর্বতের পূর্ব দিকে ছিল ধনপাদা নামে ছ’কুড়ি গৃহস্থের এক জনপূর্ণ পাহাড়ি গ্রাম। ঐ গ্রামের মেনকা এবং কপুদি নামক দুবোনের ছেলে মেয়ে ছিল রাধামন এবং ধনপুদি। ফুগংতলী-দ্য-মুরাহ্ পশ্চিম দিকে ছিল বিশাল সমুদ্র। মেনকার স্বামীর নাম ছিল জয়মঙ্গল এবং কপুদির স্বামীর নাম ছিল নিলগিরি। রাধামন ছিল বড় বোন মেনকার ছেলে এবং ধনপুদি ছিল ছোট বোন কপুদির মেয়ে। রাধামন ও ধনপুদি যখন বড় হতে লাগলো তখন ঐ গ্রামে সেই ছিল ছেলেদের মধ্যে সেরা এবং ধনপুদি ছিল মেয়েদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। রাধামন বড় হওয়ার পর শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আর ধনপুদিও সারা দেশের সেরা সুন্দরী হয়ে উঠেছিল। তার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তো রাধামন এবং ধনপুদির প্রেম, এডভেঞ্চার, সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে গেংগুলিরা যুগের পর যুগ ধরে রচনা করেছে ‘রাধামন-ধনপুদি’ পালাগান যা তারা আজো বেহালা বা বাঁশী বাজিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেয়ে চলেছে। চাকমাদের ধারণা রাধামন-ধনপুদি পালাগান সাত দিন সাত রাত গেয়েও শেষ করা যায় না।

এ খেলাতে কিশোরী ধনপুদির এক বিষ্ণু দিনের কাহিনী বর্ণনা করা হবে। ঐ সময় কিশোর রাধামনের বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছিল এবং কিশোরী ধনপুদি তের বছর বয়সে পা রেখেছিল। এই বয়সে তৎকালে উঠতি বয়সের মেয়েরা



আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বারের মত বক্ষে বক্ষবন্ধনী কাপড় ‘খাদি’ বানতো। তখন বক্ষে রাঙা ‘খাদি’ এবং নিম্নাঙ্গে ঘননীল বা কালো রঙের ‘পিনোন’ পরিহিত মেয়েদেরকে দেখলে খুবই সুন্দরী মনে না হয়ে পারে না। এই বয়সেই রাধামন এবং ধনপুদি তাদের বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়ে হৈ চৈ করে বনে বাদাড়ে, জুমে, গ্রামে, পাহাড়ে, পর্বতে আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। তাদের দলের সাত জোড় কিশোর-কিশোরীর নাম ছিল— রাধামন-ধনপুদি, নিলংধন-নিলংবি, কুঞ্জধন-কুঞ্জবি, কামেচধন-কামেচবি, ফুজুকধন-ফুজুকবি, মেইয়াধন-মেইয়াবি এবং ছেইয়াধন-ছেইয়াবি।

এ সাত জোড় কিশোর-কিশোরী কেবল বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো তা নয় তারা দু’দলে ভাগ হয়ে নানা ধরনের খেলাও খেলতো। তাদের খেলার মধ্যে ‘ঘিলা’/ ‘গিলা’ নামক এক প্রকার বড় আকারের পিঙ্গল রঙের ফলের বিচি দিয়ে ‘ঘিলা-খারা’ নামক এক প্রকার খেলাও ছিল। এ খেলা চাকমাদের ‘ফুল--বিঝু’ দিনেও খেলা হয়। যখন দু’দল খেলোয়ারের মধ্যে একদল ছেলে এবং অপর দল মেয়ে হয়ে থাকে, তখন এ খেলা খুবই জমে ওঠে। উল্লেখ্য যে চাকমারা বাংলা বর্ষের শেষ দিন যে উৎসব উদযাপন করে তার নাম ‘মুলবিঝু’। আর ‘মুল বিঝু’র আগের দিনকে ফুল-বিঝু বলে। রাধামন এবং ধনপুদিও তাদের সাথীদের নিয়ে ফুল-বিঝু দিনে ‘ঘিলা-খারা’ খেলেছিল। তাদের দু’দলের মধ্যে রাধামন ছেলেদের এবং ধনপুদি মেয়েদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাধামন- ধনপুদি ব্যালাডের ‘ঘিলা খারা’ অংশ থেকে নিম্নে কয়েক লাইন তুলে ধরা হলো-

## ঘিলা খারা

ভঙি পলগি ফুল - বিঝু  
তার পর দিন মুল- বিঝু।  
সমারে বেরাদন গুরাঝাক  
ঘিলা ভাগ গল্য চলাবাপ।  
ধোর্ল্য ঘিলা এক তাগত  
মিলায় মদে এক ফাগত।।

-----

পেংগুল রাঙা ঘিলাগুন  
কমর দ-র মিলাগুন ।

-----  
দাৰু তুলি মুরাতুন  
পোয়ল্য মারিবাক মরতুন ।  
ধারেইয়া তাগল্ লই গলা কাপ্  
মারিবাক হুগুম দিল চলাবাপ ।  
রাঙ' সমারে পিদোলে  
ধোল্যাক জিদবাদ দিদলে ।  
মন' উল্লাঝর তরঙ্গ  
ঘিলা খারা হোল্ আরাঙ ।।

-----  
সুরে পাদেই ঘিলাগুন  
দিলাক ঙ্গুতুক মরতুন ।  
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক  
মদে মারি ন পেলাক ।।  
পাদেইয়া গিলা বোদিলাক  
মিলাগুন মারা উখিলাক ।

-----  
ঘিলায় ঘিলায় তাক লাগন  
আদাম্যা পারাল্যা চেই আঘন ।  
সুদা ফালি তালেই যার  
দিন দিন পুগ' বেল হালেই যার ।।

-----  
খুঝিয়ে ঘিলা মারদন  
মিলাগুন সালেঙ্যত উদধন ।

-----  
ন পার্ল্যাক মারি ঘিলাগুন  
লাজে ভংগ দিলাক মিলাগুন ।  
পোঝিম' ছাবা পুগত পোল

ঘিলা খারা সাংগ হোল ।  
পেক্কুয়া দগরের চিং চিং চিং  
বঝর' শেষত ইক্কুয়া দিন ।  
ভঙি পরেল্লি বিঝু দিন ।।

[সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা সম্পাদিত  
রাধামন-ধনপুদি । ১ম খন্ড । ১৯৮০ । পৃ২২-২৬]

রাধামন-ধনপুদি ব্যালাডে উপরের কথাগুলি থেকে সেদিনের ঘিলা-খেলার ব্যাপারে যা জানা যায় তা হলো ঐ খেলায় গ্রামের ছেলে মেয়েদের নানা বা দাদাস্থানীয় ব্যক্তি চলাবাপ রেফারীর ভূমিকা পালনা করে । দু'দলের মধ্যে জিতার আগ্রহ নিয়ে জোর খেলা চলে । প্রথমে ছেলের দল তাদের ঘিলাগুলি নিয়ে মেয়েদের ঘিলাগুলিকে তাক করে মারতে মারতেও জিতেতে পারেনি । এরপর মেয়েরা ধনপুদির নেতৃত্বে যখন জিতে জিতে অবস্থায় পৌঁছে তখন চলাবাপের ইশারায় রাধামন মেয়েদেরকে তাদের নিম্নাঙ্গে পরনের কাপড় 'পিনোন' -এ ঘিলা স্পর্শ করাতে পারবে না দোহাই দিয়ে সেদিন ঘিলা খেলা ভঙ্গ করে দেয় । এভাবে তাদের ফুলবিঝুর দিনটি শেষ হয় ।

ফুলবিঝুর পরের দিন মূল-বিঝু মানে আসল বিঝুর দিন । সেদিন ভোরে কিশোরী ধনপুদি সেজে গুজে মায়ের কাছে তার নানা চলাবাপকে নদী থেকে জল এনে স্নান করানোর অনুমতি চাইল । তার মা কপুদি মেয়ের কথা শুনে খুশি । সে তার মেয়েকে ঐ কাজে উৎসাহিত করতে লাগলো । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গ্রাম দেশে চাকমা মেয়েরা মূল বিঝু দিনে তাদের দাদ-দাদী, নানা-নানী বা সে জাতীয় উপরিস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দেরকে নদী থেকে জল এনে স্নান করানোর পর তাদের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করে । চাকমা শিশুরাও খুব ভোরে নদীতে স্নান করতে গিয়ে 'বিঝুগুলা'/(বিঝু-ফল) খুঁজতে যায় । প্রকৃত পক্ষে 'বিঝুগুলা' মানে বিঝু-ফল হলো এক কাল্পনিক ফল । ঐদিন শিশুদেরকে নদীতে গিয়ে স্নান করার উৎসাহ দেওয়ার জন্য মায়েরা ঐ বিঝুগুলা (বিঝু-ফল) এর কথা বলে থাকে । মূলবিঝু এবং নূয়া-বঝর বা নববর্ষের দিন চাকমা জনসাধারণ (নতুন কাপড় পরে) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে কুশল বিনিময় করে । তাদেরকে সব

বাড়িতেই নানা ধরনের মিষ্টি, পিঠা, পাজোন, (পাঁচন) এবং পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তাই ধনপুদিকে তার মা কপুদি তাদের নানা চলাবাপকে স্নান করানোর পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বিবুর দিনে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে বলেন।

সেদিন ধনপুদি মায়ের অনুমতি পেয়ে প্রথমে রাধামনদের বাড়িতে গিয়ে রাধামনের বোন নিলংবিকে ডাকতে গেল। তাপর দু'জনে মিলে তাদের অন্যান্য সখীদের/ সাথীদের ডেকে জড়ো করার পর নদীতে কলসী নিয়ে জল আনতে গেল। তখন তাদের কলকাকলীতে নদীর তীর মুখরিত হয়ে ওঠলো। কিশোরীরা যাবার সময় নদীর তীরে তীরে আর বনপথে দু'হাতে বহু বুনো ফুল ছিঁড়লো। এ ফুল তারা কলাপাতা বা অন্য কোন পাতায় তুলে নদীর দেবী 'গণ্ধীমা'র উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দিয়ে মনে মনে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করবে। আবার কেউবা হয়তো ঐ ফুল কোন পাতায় করে নদীর দু'তীরে কোথাও রেখে 'গণ্ধীমা'র উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবে। সেদিন প্রথমে কিশোরীরা নদী তীরে বালির চরে তাদের কলসী রাখলো তারপর তারা একে একে নদীতে পাতায় করে ফুল ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সেদিন ধনপুদিও একটি পাতায় এক জোড়া ফুল তুলে নদীর জলে 'গণ্ধীমা'র উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় মনে মনে দেবীর কাছে রাধামনকে জন্মে জন্মে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য বর চাইল। (গণ্ধীমা হয়তো ধনপুদিকে সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন!)।

এরপর কিশোরীরা একে একে নদী থেকে জল নিয়ে তাদের কলস পূর্ণ করে এক জোট হয়ে তাদের 'আজু' মানে নানা চলাবাপের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। ততক্ষণে দূর থেকে চলাবাপ নাতনীদের কলসী সহ দেখে যা বুঝার বুঝে ফেলেছেন। নাতনীরা যে তাকে খুব করে কলসীর পর কলসী ঢেলে স্নান না করিয়ে ছাড়বে না সেটা বুঝতে পেরে চলাবাপ মাচাংঘরে পিছনের 'ওজেলং' কক্ষে ঝুড়ি একটা মাথার উপর উল্টো করে ঢেকে লুকিয়ে রইলে। কিশোরীরা প্রথমে তাদের নানাকে খুঁজে পেল না। কিন্তু তারা পরে তাদের নানী চলামার ইঙ্গিত পেয়ে ঐ ঝুড়ি উল্টিয়ে নানা চলাবাপকে ঐ ঝুড়ি থেকে বের করে ফেললো। আর বন্য কুকুরগুলি যেভাবে কোন গোসাপ দেখলে সেটার চারিদিকে ঘিরে ধরে সেভাবে তাদের নানা চলাবাপকে ঝুড়ি উল্টিয়ে বের করে ফেললো। এভাবে নাতনীদের হাতে ধরা পড়ার পর চলাবাপ তার ছয়কুড়ি বছর বয়স, সর্দি হবে, ঠান্ডা লাগবে ইত্যাদি নানা কথা

বলে ও অজুহাত দেখিয়েও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে স্নান করতে রাজী হলেন। তখন তারা তাকে মাচাংঘরের সম্মুখস্থ খোলা মাচাং 'ইজর'-এ পিঁড়ার উপর বসিয়ে কলসীর পর কলসী থেকে জল ঢেলে স্নান করালো। চলাবাপ স্নানের পর নতুন কাপড় পরে খুশী মনে নাতনীদেবকে আশীর্বাদ করলেন। [ এই কাহিনীই নিম্নে সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা কর্তৃক সম্পাদিত 'রাধামন-ধনপুদি' ১ম খন্ডের 'বিজুদিন কথা' অংশটি থেকে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য এটি রাজ্যমাটির রাজ্যপানি গ্রামের স্বর্গীয় মুক্তারাম চাকমা (লাক্সা গাংগুলি) -এর নিকট থেকে সম্পাদক কর্তৃক সংগ্রহীত হয়েছিল। নিম্নে 'বিজুদিন কথা' - এর কিছু অংশ। ,

## বিজু দিন' কথা

পেকুয়া দগরের চিং চিং চিং  
বঝর' মাধাত ইকুয়া দিন  
এচে সেদিন্যা বিজু দিন।।  
সাবে বানল্য রংকুধি  
বিদ্যাসুন্দর গমপুদি  
তাম্মারে কয়া ধোলা ধনপুদি।  
বীজি খেইয়া খাজুরে  
মে ইরি দে মা-  
গাধেই এযংগোই আজুরে।।  
জুর পানি শিল' কুয়া  
ইকুয়া গোরি হোইয়চ তুই  
নোনেইয়া ঝিবুয়া মিলাপুয়া।।  
দগরের পেকুয়া চিং চিং চিং  
দারু তুলি হরিং শিং  
পোজ্যে ইচ্যা বিজু দিন  
বঝর' মাধাত ইকুয়া দিন।।  
ঘুম' তলোই থং বোদি  
কয়া ধোল্য কপুদি  
ধারেইয়া তাগললোই গলাকাব

যা যা মা ...

ভুবন' কুলত ইকুয়া গোরি আঘে  
ত আজু চলাবাব।।

আমন্তলে কুরাবুয়া  
ইকুয়া গোরি হোইয়ে ভুবনড  
ত' আজু চলাবাব বুরাবুয়া।।

পানি ভোরি পহ্ন লয়  
বুদ্ধিয়ে ত' আজু কম নয়।  
কালি ভোরি শিক দিলুং

যা যা মাধু ...

ত' আজুরে গাধাগোই  
ইচ্যা নাঙে ঈরি দিলুং।।

ভূরা দার্বুয়া চিরিচ্ছেই  
ঝাদি মাদি ফিরিচ্ছেই

আমন্তলে কুরা পাল  
দিন দিন পেরি যার মর বুরাহকাল।।

ইজা মিজেই পোরুলত

ব্যাধি জন্মায় বুরাকালে শরীলত।।

বোচ্ছি বেইয়া ছিপ্ দিবে

গর্বা গোর্বি বুঝ দিবে।

উধিল সালেং মাছ লুই বাদে  
 গৰ্বা গোৰ্বি ইচ্যা  
 বুঝ দি পার্তুং নয় তুই বাদে ।।  
 সাবে বান্ধ্য রংকুধি  
 বিদ্যা সুন্দর গমপুদি  
 সেকধা শুনি তাম্মাত্তন বিদেয় লই  
 শেলোক্যা কুম্ম করত লোই  
 লামিল বেবেই ধনপুদি ।।  
 কাত্যা সুদা তুম গোজ্যে  
 আদাম দিয়ালী যা ধোজ্যে ।  
 পুরান তবলে হিরন দি  
 ঘিলা খারা পিলাংদি  
 ইজর' মাধাত...  
 নিঘিলি চেই আঘে...  
 বেবেই ধনপুদিরে নিলংবি ।।  
 পিধা গুরি তেকোগোই  
 নিলংবি ভোন্নরে দেখ্যোগোই ।  
 ভরা বোন্দুক তাগেত্তে  
 মাদি বেগেনা ছাগেত্তে  
 নিলংবি ভোন্নরে  
 বেবেই ধনপুদি দাগেত্তে ।।  
 মাঝে খেল শিল' খেই  
 আয় আয় গাদে এ গোই  
 বিজু পরবত আজুরেই ।।  
 ছরাছরি ঈজনে দুলু বাঝ' বিজনে  
 যগনে লর দিলাক দ্বিজনে...  
 রাজা লগে ঘণ্ডাত্যা  
 ধুল কাদি পণ্ডত্যা

তারা দ্বিজনে দাগা ধোল্যাক্কোই সমাজ্যা  
 ছরাছরি তেক্ অলাক  
 ছ-কুরি ঘজ্যা  
 গাভুর মিলাগুন  
 যগনে বেঙ্কুনে এক হ্লাক ।  
 ধোল্য গাঝত পাগোজ্যা  
 কধা নিঘেল্যাক নাগোজ্যা  
 যাদন পিয়ারী সুর বাত্যা  
 যাদন তারা সুর ঘাত্যা  
 গোচ্যা কাবি কুরে কুর  
 ইন্দ্র নাভুয়া বাদল ধুল  
 চিগোন ছরাত পর্তে গোই  
 পধ' দেন্ কুলত বাংকুলত  
 এক এক জনে-  
 ছিনি নিলাক ফুল' জুর ।।  
 লেবা সিবিদি পান গালত  
 যগন পলাক্কোই গাণ্ড পারত ।  
 দিঙিত দিলং কিলা থ্‌ক  
 হাঝি লামিলাক গাণ্ড পারত ।  
 লেবা সিবিদি পান গালত  
 যা' যা' কুম্ম থোইয়ন বেঘে গাণ্ড'চরত ।  
 জাদি পুজাত স গরের  
 কাত্যা সুদা ব গরের  
 গাণ্ড পারত লামি-  
 বেবেই ধনপুদি কি গরের ।  
 কুজি দগা ফিরি দ্যো  
 বেবেই ধনপুদি গণ্ডীমারে-  
 দ্বিবা ফুল' জুর ইরি দ্যো ।।  
 দৈয়ে খিয়া সর মাগের

জন্মে জন্মে দাদারে পায় পাৱা  
 বিধু ধনপুদি গণ্ডীমাত্তন বর মাগের ।।  
 দগরের পেকখুয়া কেতকেত্যা  
 ফিরা ধোল্যাক মিলালক ঘরকেত্যা ।।  
 ঘরায় দুগ্ধল্য ময়দানত  
 লুণ্ডন আজুর উধানত ।  
 ধারেইয়া তাগললোই গলাকাব  
 দেগিল মিলাউন চলাবাব ।  
 মানিক বেগেনা ছাগেল্লোই  
 মিলাউন দেই  
 আজু চলাবাব  
 বাৱেং ধাগি আঘেগোই ।।  
 ভৱা বোন্দুক তাগদন  
 মিলালগে—  
 আজু চলাবাবরে দাগদন ।  
 সিবিদি বাঝেই পানানত  
 গায় গায় বোই আঘে  
 নানু চলামা চানানত ।।  
 কুজি কুজি উলানি  
 ধুন্দা তুলা সান  
 হোইয়ে নানুর চুলানি ।  
 চগদায় কামাল্য ঘেৱে আম  
 চিধা চিধা হোইয়েগি  
 অজল নিজ কোইদ্যা সান  
 নানু চলামার কেইয়া চাম ।  
 ধেঙি পাদি নাঙেললুয়া  
 বাদোল' খেজ্যা সান  
 ইদি কল' সান  
 হোইয়ে নানুর কাঙেললুয়া ।।

তেঙা ভাঙি পোয়কা লর  
 বেবেই ধনপুদি—  
 নানু চলামাত্তন বিজার লর ।।  
 অজল তঙত দ্যং সাঙু  
 আজু কুধু গেল মর নানু ।  
 ঘরান তুলি পিজিৱা  
 দিল নানু চলামা ইজিৱা ।।  
 কবা বিনি ফুদিলাক  
 ইঝিৱা দেগি মিলালগে  
 আজু চলাবাব' ঘরত উধিলাক  
 বীজি খেইয়া খাজুৱে  
 ঝাৰুয়া কুগুৱে  
 গুই তগানা সান গোৱি  
 তগা ধোল্যাক আজুৱে ।।  
 গোচ্যা ছিদি কুৱ পেইয়ন  
 যগন মিলালগে  
 ওজলেঙ' ছেৱে  
 আজু চলাবাবরে সুক পেইয়ন  
 সিবিদি বাঝেই পানানত  
 আনলাক ধৱাধোজ্যা গোৱি  
 আজু চলাবাবরে চানানত ।।  
 তোনান রানি ওলেলাক  
 যগন আজুৱে চানামায়  
 চোগি পিৱান দি বোঝেলাক ।  
 পানে খেইয়া সিবিদি  
 গৱা ধোল্যাক বিগিদি ।।  
 মু-বাহ্ ভাঙি মধু খাচ  
 মিলা দেলে তুই কুধু যাচ ।  
 ভোতি উজাল ভৱাত্যা

মিলা দেলে ধরাচ ক্যা ।  
 কবুয়া কুল্য কম-গাঝত  
 মিলা দোরেলে-  
 জম্মেলে ক্যা তুই  
 ও আজু সংসারত ।।  
 ভাদে রানি ন চোরেচ  
 ন দোরেচ আজু ন দোরেচ ।  
 পানে বাঝেই সিবিদি  
 গর্তন আজুরে বিগিধি ।  
 মুরা উধি খ- নিঝাচ  
 আজু ফেলা ধোল্য-  
 ব-নিঝাচ ।।  
 বোত্যা দোরি ঘন' পাক  
 কয়া ধোল্য আজু চলাবাব ।  
 দৈয় মাধাত ঘি গোৰ্ত্তুং  
 ইক্কু মিলা ন দোরেই-  
 ও নাদিন কি গোৰ্ত্তুং ।  
 দানী সগলে দান গরে ।  
 গোচ্যা কাবি খার গরে ।  
 বুরোকালে বেচ গাধিলে ও নাদিন  
 মর ভারি গরিনে জার গরে ।  
 মানিক বেগেনা ছাগংগোই  
 সেনে ও নাদিন-  
 কান্নোং ধাগি আঘংগোই ।  
 বাবর দিনত বাব গাভুর  
 যার যার দিনত তে গাভুর ।  
 কবুয়া কুল্য বুবুরত  
 কেনা ন গেল ও নাদিন  
 তমারে লাঘত ন পেলুং

মুই গাভুরত ।।  
 পিরাত বোঝেই মদ'খাপ  
 কল আজু চলাবাব ।  
 বয়চ গেল্ সগলর  
 যুগ গেল্ সগলর  
 সিবুং চাজি' গব হার  
 পুরানি দিন মাধান-  
 ন হব আর ।  
 দৈয় মাধাত ঘি গোৰ্ত্তুং  
 ছচ হারা হোইয়ং নাদিন কি গোৰ্ত্তুং ।  
 আহমত তলে কুরাহ পাল  
 দিন দিন পোরি গেল্ বুরাকাল ।  
 ভুরা দারুয়া চিরি গেল্  
 ইচ্যামর- ছ-কুরি ববর বিদি গেল্ ।  
 কাবর ধোইয়ে দোগোনত  
 পিধা সিজৈই পোগোনত  
 উজনম কি পাপ গোজ্যং কি জানি  
 চোলি ফিরি ন পাজ্যা হোই  
 বাজি আঘং মুই ভুবনত ।।  
 বীজি খেইয়া খাজুরে  
 বিগিধি গরের ধনপুদি আজুরে ।  
 ছরা উজানি জুনিবাক  
 বেরত গুজেই মদ খাপ্  
 সে কথা শুনিই  
 কল আজু চলাবাপ ।  
 দারু তুলি রানিত থাক  
 তদ্যায় কি রাগেইয়ং ও নাদিন  
 শুনি থাক ।  
 ভিরি বানিলুং চোৰ্গি কিল্



মিদিঙ্যা মরা কোয়দ্যা গিল্  
 কোয়দ্যা গিলত কোয়দ্যা নেই  
 তমারে মেমা মিচ্ছিবি খাবেবার মর  
 পোয়ঝা নেই ।।  
 ভরা বোন্দুক তাগেইয়ং  
 বোত্যা দোরি পাগেইয়ং  
 ইকুয়া গোরি বীজরবুয়া  
 ত' নাঙে ও নাদিন রাগেইয়ং ।।  
 বেদে ফিরি চাজি দ্যন  
 সেকধা শুনিনে ...  
 গোলি গোলি মিলালগে হাঝিদ্যন ।।  
 সুদা ফালি তালেইয়ে  
 পুগ' বেল হালেইয়ে  
 আমারে ন খাবেই ক্যা ও আজু  
 ছরা আগারে যেই  
 হাঙোপঙা লোই  
 কাঙারারে জুম সুদা ন দ্যচ  
 তুই সিবালোই মালেইয়ে ।।

আঃ নাদিন দৈয় মাধাত ঘি গোতুং  
 পুরানি দিন মাধাত হারেলুং কি গোতুং ।  
 ধোল্য গুলা বিঝিরে  
 ইয়ানি কর্ম লিগি দিল মে বিধিয়ে ।।  
 বীজি খেইয়া খাজুরে  
 বেঙ্কুনে গাধেলাক আজুরে ।  
 কার্মা কুম্ম সাঝিত পাত্  
 দিল আজু আশীর্বাদ ।  
 শাগ' আগা কোর্মে'দা  
 আগা ভাঙি ভোর্মেদা  
 ও নাদিনলক ...  
 আর এযেত্তে জনম  
 কর্মফলে গমদালে জন্মেদা ।।  
 গাবদ্যা মাদল বেদাগোই  
 যে যিবা আঝা গোজর্  
 ও নাদিন মনে মনে পেদাগোই ।  
 মজা ঘরত উভা থক  
 খুঝি অলাক মিলা লক ।।

---

[জনাব সুগত চাকমা, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট,  
 রাঙ্গামাটি ।]

# একটি স্বরচিত চাকমা গান

প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা

ও নাগুরী ও গাবুরী ...  
আয়ন্যা সমারে রান্যাত যেই  
ত হাল্লোঙ-অ ল তোগেই  
তাগলান্ মুই ধারেই লুয়ঙ  
বেলান উদের ঝাদি ঝাদি  
আয়ন্যা থেঙ ফেলেই  
ও নাগুরী ... ।।

ধিঙি শাক তুলি, ইজা মাচ ধুরি,  
আমি সরাতুন লবং,  
ভাচ্চুরি গুদেই, এক সমারে,  
সোয়াদে হেবং ।  
দিবুজ্যা অ-লে জুর আলু তোগেই  
যেদক হুজি মনে চায় পারিবং হেই ।  
ও নাগুরী ... ।।

বেলান্ ডুবিলে, পেক্ক দগল্লে,  
আমি ঘরত্ এবং  
নানা তোনপাত্ হাল্লোঙ পুরেই  
লগে আনিবং ।  
বেচ্ দিরি অ-লে তম্মা গুবিব  
সেক্কে তারে হি দিন্যায় বুঝ দিবে চেই?  
ও নাগুরী ... ?

**অনুবাদঃ-** ওগো প্রিয়ংবদা যুবতী, এসো সাথে পুরানো জুমে বেড়াতে যাবো। তোমার বুড়িটি খুঁজে নাও, আমার দাখানায় শান দিয়েছি, বেলা যে বাড়ছে দ্রুত। চলো তরা করে পা ফেলি। ওগো প্রিয়ংবদা আমরা টেকি শাক তুলবো, ছোট নদীতে ধরবো মাছ ও কাঁকড়া। আর সেগুলি (কচি) বাঁশ কোড়লের সাথে রন্ধে সেই সুস্বাদু খাবার তৈরী করে এক সাথে খাবো। বেলা (গড়িয়ে) দুপুর হলে সেথায় ঠান্ডা আলু খুঁজে নিয়ে যত খুশি খেতে পারবো। বেলা পড়ে গেলে পাখিদের কলকাকলী শুনে আমরা ঘরে ফিরবো। সাথে আনবো (কুড়িয়ে পাওয়া) নানা তরিতরকারি। বেশী দেরী হলে যখন মা বকবে তখন তাকে কি বলে বুঝ দেবে ওগো প্রিয়ংবদা।

---

[ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

# সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি

রমনী মোহন চাকমা (চিগোন চান)

সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি, মুছে যাওয়া দিনগুলি, ফেলে আসা দিনগুলির বহু স্মৃতি ও আনন্দ বেদনার কথা কেন জানিনা বার বার মনে পড়ে। আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অগ্রভাগ কাটে সেই খাগড়াছড়ি মহাজন পাড়ায়। গ্রামের লোক পেশায় প্রায়ই সবাই চাষী। জমিতে ধান চাষ করা ছাড়াও তারা জুম চাষও করতো। অনেকের কাছে বেশ ভাল ভাল শিকারী কুকুর, শিকারী মোরগও ছিল। এ সকল কুকুর জঙ্গলী সাপ, গুই সাপ এবং কচ্ছপ পাকড়াও করতে বেশ পারদর্শী। শিকার করা আমাদের নেশা ছিল। অনেকের মাঝে এটি আংশিক পেশাও বটে। তাই তাদের শিকারী কুকুর বা শিকারী মোরগ প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়।

গ্রামের লোকদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন ছিল নিবিড় ও নির্ভেজাল। যদি কারো শাক-সবজি কম পড়ে, খোরাকীর ধান কম পড়ে, অন্য জন তাকে ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে আনার প্রস্তাব করতো। চুরি, ডাকাতি কমই ছিল। রাত্রে আমরা দরজা খোলা রেখে ঘুমাতাম। গ্রামে অনেক নিরক্ষর লোক ছিল কিন্তু তাদেরকে অশিক্ষিত বলা যায় না। কারণ তাদের মাঝে মানবীয় গুণাবলী ছিল উঁচু মানের। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন থাকলেও পূজা এবং ঝার-ফুঁকের প্রাধান্যই বেশী ছিল।

মহাজনপাড়া সমতল জায়গায়। কিন্তু গ্রামের চারিপার্শ্বে টিলা এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই কারণেই আমাদের বাঁশ, বেত এবং কাঠের অভাব ছিল না। শিকারেরও কোন অভাব ছিল না। নারানখাইয়া বিল মাছের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অনাবাদী বিল ছিল প্রচুর। এই অনাবাদী বিলে, ছোট ছোট নালা ও স্রোতাসিনীতে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যেতো। হরেক রকমের বুনো পাখী, হরিণ, বাঘ, জীব-জানোয়ারের ডাকে জঙ্গল গম্ গম্ করতো। বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দাদের মতো আমরা, গ্রামবাসীরা ফল-মূল থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রোটিন জাতীয় খাবার প্রকৃতি থেকে অনায়াসে সংগ্রহ করতাম। শাক-সবজি এবং ধান ক্ষেতের মনোরম দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে। আরও ভাল লাগতো পাহাড়ের ঢালু জায়গায় জুমের কচি কচি ধানের গাছগুলি যখন দক্ষিণা বাতাসে আন্দোলিত

হতো। মনে হতো প্রকৃতি যেন নবরূপে যৌবন লাভ করেছে। এ দৃশ্য দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। কবিত্বের ভাব আসে। কলম ধরতে ইচ্ছে হয়। যেমন আমি লিখেছিলাম-

ও... ও... ও... জুম ধানানি কাপ্ কাপ্ অয়ে দগিন বুয়ারে  
এঙা-বেঙা হক্ হক্ অয়ে নাজের বুয়ারে।  
জুম্ ভেয়র ধান এ বঝর ভারি দোল অয়ে  
বগলত্ তাগল কমরত্ হাত্ জুমান্ চে রয়ে  
মন সুগে জুম্ ভেয়ে সিঙ্কারি-কারি বেড়াতে  
মোনঘরতুন তামুক্য দাতুন দেঘে দেঘে হাজেত্তে। (কিছু অংশ)

জুম্ চাষী ভাই আনন্দে কোমরে দু'হাত রেখে এ অপূর্ব সৌন্দর্যের সমারোহ অবলোকন করতো। হরিণের ডাক ও পাখীর কলতানের সাথে মোনঘরের শিঙার সুমধুর ধ্বনি মিলে অপূর্ব সুরলহরীর সৃষ্টি হতো। আর এ সুর মুর্ছনায় জুম্ ভাই তন্ময় হয়ে যেতো। এ সময় তার প্রিয়তমা, অর্ধাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর,- চিজিক্য বাপ!! আর কতক্ষণ আছে? চল ঘরে ফেরার সময় হয়েছে! আহ্ কি সুখ! কি আনন্দ ! এ চাষী ভাইয়ের !!

অগ্রাহায়ণ মাসে আমন ধান পাকে। আর ভাদ্র- আশ্বিন মাসে পাকে জুমের ধান। এ দুই মাসে নবাহ্নের উৎসবে গ্রামে আনন্দের ধুম পড়ে যেতো। ঘরে ঘরে হরেক রকমের পিঠা তৈরী করা হতো। শুরু হতো নেমতনের পালা। একে অপরকে নিমন্ত্রণ করতো। যেন খাওয়াতে পারলেই প্রত্যেকের আত্মতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি মেলে।

“বিবু” উৎসবের কথা বেশী মনে পড়ে। বিবু উপলক্ষে ‘রান্যা’ বেড়ানো এবং উঠঠি বয়সী ছেলে-মেয়েদের রান্যা বেড়ানোর আনন্দ, কোলাহলের ধ্বনি, এখনও কানে বাজে, চোখে ভাসে। বিবুর দিনে সাত-সকালে ঘরে ঘরে গিয়ে উঠানে মোরগ-মুরগীদের জন্য ধান ছিটিয়ে দিতাম। মুরগীদের পায়ে ধরে আশীর্বাদ নিতাম। দাদা-দাদীরা ঠাট্টাচ্ছিলে ও খুশীতে বলতেন, “তুমি যেন একটা ফর্সা এবং সুন্দরী বউ পাও” তারপর শুরু হতো এ ঘর থেকে ঐ ঘরে বেড়ানোর পালা। সারা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। যতই বেলা বাড়তে থাকে ততই দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তো। শুরু হতো রেং (আনন্দের ধ্বনি)। এ সময় মদিরাদেবীর সহচর্যে এসে বন্ধুদের কথার মালাগুলি হয়ে যেতো আড়ষ্ট, অস্পষ্ট এবং

অগোছালো। এদের পা গুলো হতো নড়বড়ে। ইটতে গেলে পা গুলো এদিক ওদিক বেঁকে যেত। নির্বোধ শিশুর মতো সঙ্গীরা অস্পষ্টভাবে আধো আধো কথা বলতে শুরু করতো। আরো একটু পরে দেখা যেতো অনেক সাথী প্রখর রোদ্রে রাস্তার পাশে গাছের নীচে দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছে। তখন কিছুক্ষণের জন্য মদিরাদেবী স্বর্গের তপোবনে নিয়ে যেতো। এর নাম বিষ্ণু! এ দৃশ্য এখন শুধু আমার স্মৃতি।

সাংস্কৃতিক অংগনেও আমার গ্রামটা পিছিয়ে ছিল না। বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রায়ই ঢুলি এবং যাত্রা দল আনা হতো। তাছাড়া গ্রামে “গেংগুলী” গানের আসর থেকে শুরু করে নানা পালার আসর বসতো। নাথেং খেলা, ঘিলা খেলা, পোর হারা (দাঁড়িয়া বান্দা), গুদু খেলা (হা-ডুডু), ফুটবল খেলায় গ্রাম আনন্দে মুখরিত ছিল। গ্রামে এক শ’ বছরেরও বেশী পুরাতন বট গাছ, আম গাছ ও তেঁতুল গাছ ছিল। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমের দিনে ঐ গাছগুলির নীচে আড্ডা দিতাম, খেলা করতাম। এ মধুর মিলন মেলা কখনও কি ভোলা যায়?

দিনে হরিণ ও শুকর শিকারে বের হতাম। আর রাত্রে শিকার করতাম ঘুমন্ত বুনো পাখী। বন্য শিকার বধ করার পর মাংস ভাগ বাটোয়ারা পদ্ধতি বর্তমান কালে অভিনব মনে হলেও ঐ পদ্ধতি ছিল আমাদের প্রীতি, সম্প্রীতি ও মমতার বন্ধনে গাঁথা। মাংস ভাগ করার সময় যে কেহ উপস্থিত থাকলে তার ভাগ্যে এক ভাগ জুটতো। এটাকে বলা হতো ‘মিলনী ভাগ’।

খবংপড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখি বাগানের ভিতর এক উঁচু গাছ। বেশ উপরে এক পাখী বাচ্চাদের জন্য ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে গাছের গর্তের মধ্যে ঢুকছিল। বানরের মত লাফ দিয়ে গাছে উঠলাম এবং ঝড়ের পতিতে নিঃশব্দে পাখীটা যে গর্তে ঢুকেছিল ঐ গর্তে হাত বাড়লাম। অমনি পাখীটা ধরা পড়লো। পাখী যখন উচ্চস্বরে চৈঁচৈঁ শুরু করলো তখন ঐ বাগানের বুড়া (বাগানের মালিক) ঘর থেকে বেড়িয়েই আমাকে দেখলো। আর বুড়োকে জোরে সোরে বলতে শুনলাম, ওরে শয়তান। এটা কি করছ? আমি পিছনে একটু তাকলাম। তারপর লম্বা দৌড়।

বয়োজ্যেষ্ঠদের যেমন শ্রদ্ধা করতাম তেমনি ভয়ও পেতাম। যদিও তারা আমাকে বেশী স্নেহ এবং আদর করতেন। বন্ধুদের নিয়ে লিচু, আঁখ, শসা, তরমুজ এবং আম চুরির ঘটনাগুলো এখন, বেশ মনে পড়ে, ফল চুরিতে ধরা খেয়েছিও।

কিন্তু কেন জানি লজ্জা না পেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিস ফিস করে হাসতাম। এগুলি এখন কল্প কাহিনী মাত্র!

গ্রামের লোকদের একে অপরের সাথে যে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যের বন্ধন ছিল তা- না দেখলে বর্ণনা করা যায়না। কারোর অসুখ-বিসুখ হলে সবাই এগিয়ে আসতো এবং প্রয়োজনে সারারাত জেগে রোগীর সেবা শ্রদ্ধা করতো।

‘প্রত্যেকে আমরা পরের-তরের’ গ্রামের লোকদের এ - সেচ্ছাসেবা মনোবৃত্তিই গ্রামের সামাজিক সংহতি (Social integration) কে আরো দৃঢ় ও মজবুত করেছে। এবং এ সামাজিক সংহতিই গ্রামে সামাজিক সম্পদে (Social capital) পরিণত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ- সামাজিক সম্পদ থেকে সৃষ্ট ব্যক্তিও সামাজিক মূল্যবোধ গ্রামের লোকদেরকে যুগে যুগে মানবীয় গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান করেছিল।

অনেক বছর আগে আমি এ গ্রাম ছাড়ি। থাকি ঢাকায়। আর সময় সময় দিল্লী, বোম্বে, কোলকাতা, করাচী, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর বা জাকার্তায় পেশাগত কাজে যাই। কিন্তু এত শহর, দেশ দেখার পরও কোন দেশ বা শহরে আমার সেই ছোট গ্রামের মত আমার মনকে আকৃষ্ট করতে পারিনি। অনেক দেশ দেখে সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছি কিন্তু আমার গ্রামের মত ভালবাসতে পারিনি, হৃদয় দিতে পারিনি। এক সময় সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল্লুকে আজারবাইজানে জাতিসংঘের কার্যক্রমের আওতায় চাকরি করতাম। মফস্বলে যেতাম ঘনঘন। কাম্পিয়ান সাগরের পারে পারে ঐতিহাসিক সিন্ধুরোড বেয়ে গাবেলা, সেকি, সেমকির এবং মিংগাসিবিরে গিয়ে বরফ ঢাকা রেপ্ট হাউসে যখন ভল্লুকের মাংস, হরিণের মাংস খেতাম তখন আমার সেই ফেলে আসা শৈশবের, কৈশোরের মহাজন পাড়ার কথা মনে পড়ে। তখন মনে মনে বলতাম এ রাশিয়ার দাগিস্তান বা আজারবাইজানের হরিণ বা ভল্লুক শিকারের জন্য যদি আমি সেই শৈশবের গ্রামের বন্ধুদেরকে আনতে পারতাম কতই না আনন্দ পেতাম।

---

[ জনাব রমনী মোহন চাকমা, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। ]

# ত্রিপুরা গান

সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

ও মইন কুচুকনি বুরুইমা

সাকুর কাচাক মাচাংমা

বর থানি ফাইলাং নুং সালাংদি ।

নাইলাং নাইলাং নাইলাংদি

বাখানি ককনো সালাংদি

বাখা হাইলাং হাইলাং খায়ে তার্থাঁদি ।।

সিনিয়ৈ ব সিনিয়াতৈ খালায়ৈ

নুংগই ব নুংগইয়াতৈ খালায়ৈ

মকল পাঁজারা নাইতিয়ৈ

বাখাতা দুখু রগৈ তাঁথাদি ।

সিনিতৈ সিনিতৈ অংগ মাখাং নুংখালাই

বদায় বাইফুগ মালাইমানি লাই

ভাবেয়ে মালিয়ানা আনি লক্ষী লাই ।

কৈ দৈ কৈ তিলাং লক্ষীয়ে

মংসা বুঝিমালিয়া ভাবেইয়ৈ

মুংসাসুক হিজাঁক ফুং সিয়াগৈ

নং বন বাখা দায় তালাদি ।।



## বাংলা অনুবাদ :-

ও পাহাড় দেশের রূপসী কন্যা  
কোথায় যাবে বলে যাও ।  
তাকাও তাকাও একটু তাকাও  
মনের কথা একটু বলে যাও । ।

চিনেও না চেনার ভান করে  
দেখেও না দেখার ভান করে  
আড় চোখে তাকিয়ে  
মনে দুঃখ দিয়ে যেও না । ।

চেহারা দেখে তো চেনা চেনা লাগে  
কোথায় কখন জানি দেখা হয়েছিল  
আমার প্রিয়তো বোধ হয় জানেই না ।

কোন অভিমান করেছে কিনা  
কিছুই ভেবে পাচ্ছি না ।  
কোন কথায় রাগ করে  
মনে কিছু নিও না । ।

---

[ শ্রী প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, প্রাক্তন পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি । তাঁর রচিত গানটি তৎপুত্র জনাব জীবন রোয়াজা, ইঞ্জিনিয়ার, এল,জি,ই,ডি বিভাগ, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত । গানটির অনুবাদক- জীবন রোয়াজা ]

# ত্রিপুরা পল্লীতে বৈসুক উদযাপন

মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

বর্ষ শেষে ও নববর্ষের সময় ত্রিপুরা পল্লীতে প্রতি বৎসর অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৈসুক উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাস এলে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ঘটে। তখন বনে বনে গাছে গাছে নব পল্লব দেখা যায়। শিমুল, মাদার এসব গাছে ফুল ফুটে, বন উপবন যেন লালে লাল হয়ে যায়। তখন প্রকৃতিতেও যেন এক নব উল্লাসের সূচনা হয়। মনের আনন্দে নানা রঙের পাখী আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায় আর নানা সুরে গান গায়।

এ সময় ত্রিপুরা পল্লী গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাদের মা বাবার কাছে নতুন নতুন জামা কাপড় পাওয়ার আশা করে। তারা বৈসুক দিনে গায়ে নতুন জামা কাপড় পরে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়; বিন্মি চাউলের নানা ধরনের পিঠা খাওয়ার সময় বড়দেরকে প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। নব বধূরা বাপের বাড়ীতে গিয়ে বৈসুক উদযাপন করার জন্য তাদের প্রিয় স্বামীদের কাছে বায়না ধরে; স্বশুর শাস্ত্রীর কাছে অনুমতি চায়। এ সময় প্রেমিক-প্রেমিকারা বৈসুক নিদে প্রেমালাপের সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। গ্রাম দেশে গৃহিনীরা বৈসুক -এর দিনে পাঁচন রান্না করার জন্য বন-জঙ্গলে গিয়ে নানা রকম শাক-সবজি সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য বৈসুক উৎসবের সময় আয়োজনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পাঁচন তরকারী খেলে ভাল হয় বলে সকলের বিশ্বাস। বৎসরের শেষে ঋতু পরিবর্তনের সময় মানুষের দেহে ও মনে কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে। তখন যদি বন-জঙ্গল হতে বিভিন্ন শাক-সবজি সংগ্রহ করে পাঁচন তরকারী খাওয়া যায় পরবর্তী কালে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বৈসুক উৎসব দিনে পাঁচন তরকারীকে আপ্যায়নের প্রধান বস্তু হিসেবে অতিথিদেরকে দেওয়া হয় এবং খাওয়া হয়।

এ সময় পাড়ার কোন কোন যুবকের মনে উৎসবের ও আনন্দের আরও একটি জোয়ার আসে। তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে গিয়ে প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে গরায় নৃত্য পরিবেশন করা। এ নৃত্য পরিবেশনের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ দেওয়া নয়; এর মাধ্যমে ত্রিপুরাদের প্রধান দেবতাদের প্রতিও ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখানো হয়। দেবতা সম্পর্কে ত্রিপুরাদের বিশ্বাসের মধ্যে 'বুরাসা' দেবতার প্রধান দু'টি পুত্র হলো- কারায়া

এবং গরয়া। তারা দু'ভাই ত্রিপুরাদের বিশ্বাস মতে মংগলময় দেবতা। তাদেরকে নৃত্যের শুরুতে প্রথমে একবার শেষ দিনে আরও একবার শুকর, ছাগল ও মুরগী বলি দিয়ে পূজা করা হয়। সেই পূজার আশীর্বাদ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হয়। যেন সেই পরিবারের লোক সারা বৎসর ধরে জুন্মের কাজে গিয়ে বা বনে জঙ্গলে গিয়ে বাঁশ গাছ কাটার সময় বা অন্য কোন কাজে বেরুবার সময় কোন রকমভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয় বা হিংস্র জীবজন্তুর সম্মুখীন না হয় ইত্যাদি। কোন যুবক সেই গরয়া নৃত্যে একবার অংশগ্রহণ করলে পর পর তিন বৎসর বা তিনবার অংশ গ্রহণ করে বিরত থাকতে পারেনা।

বৈসুক উৎসবের এক সপ্তাহ আগে পাড়ার যুবকেরা তাদের পাড়ার অচাই বা ওঝাকে নিয়ে পাড়ার মুরুব্বী বা দাবিং / কাবরীদের অনুমতি নিয়ে গরয়া নৃত্যের মহড়া আরম্ভ করে থাকে। এক সপ্তাহকাল নৃত্যের মহড়া দেওয়ার পর বৈসুক উৎসব আরম্ভ হওয়ার দুই দিন আগে গরয়া দেবতার পূজা দিয়ে বৃক্ষবন্ধনী কাপড়ে পূজার আশীর্বাদ হিসেবে খই ও চাউল বেঁধে নিয়ে একটি লোহার শেলে বেঁধে নেবে। ওঝার হাতে একটি ছোট খুর্গ বা দা, একজনের হাতে আশীর্বাদের লোহার শেল। আর একজনের হাতে পূজার আসন (বাঁশের তৈরী)। এভাবে প্রথমে ওঝা তাপর শেলধারী, তারপর পূজার আসন যার হাতে আছে তাকে আগে দিয়ে যাত্রা করে পাড়া হতে বেরিয়ে পড়বে।

এভাবে গিয়ে অন্য কোন গ্রামে বা পাড়ায় প্রবেশ করার পূর্বে ঢোল বাদক ও বাঁশী বাদকেরা তাদের বাজনা বাজাতে আরম্ভ করবে। দলনেতা বা যে ডাকদানকারী সুরে সুরে ডাকবে—

### ত্রিপুরা ভাষায়

গরয়া চুং ফাইদং  
তে-সক্সিনি বাসগৈ  
হাপাং থায় সিনি কাঙ্গাই  
গরয়া চুং মাছা নাই  
খলা মুইদাম সাব থায়দি  
গরয়াবক আচক নাই  
গরয়াবক মা ছা নাই।

### বাংলা

গরয়া আমরা আসতেছি  
সাত ছড়া পার হয়ে  
সাত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে  
গরয়া আমরা নাচবো  
ঘরের উঠান সাফ কর  
গরয়ার দল বসবে  
গরয়ার দল নাচবে।।

এভাবে ডাক দিয়ে পাড়ায় প্রবেশ করে। ঘরের উঠানে এসে প্রথমে উঠানে ঘুরে নাচবে, তারপর সেই উঠান মালিক বা ঘরের কর্তা যদি সে বৎসর কারায়া-গরয়া দেবতাদ্বয়কে পূজা দিয়ে থাকে পূজার আসন উঠানে বসায় তার উপর আশীর্বাদের লোহার দণ্ডকে তার উপর দিয়ে ধরবে এবং ওঝার খর্গ তার কাছে রাখবে। যদি পূজা না দিয়ে থাকে তখন মাটিতে এসব দ্রব্য বসাতে পারে না; হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ধরে রাখতে হবে। যখন ঢোল বাদকেরা বাঁশীর তালে বাজনা আরম্ভ করে নাচিয়ের দল নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এভাবে ক্রমানুসারে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরাদের প্রধান জীবিকা ছিল হোগ চাষ বা জুম চাষ, গরয়া নৃত্যের দল সেই জুম কাটা হতে ধান বপন করা, জুমের আগাছা পরিস্কার, ফল সংগ্রহ, সুতা সংগ্রহ, তিল সংগ্রহ, কাপড় কাচা, তুলা ধুনা, সুতা কাটা, ধান ভানা, পিঠা তৈরী, কলসী বানানো, বিভিন্ন পশু পাখীর নানা কাজের দৃশ্য যেমন-ভাল্লুকের মধু খাওয়া, কাঠখুকরার কাঠ টোটা, মরদেহের দাহের পূর্বে মাংগাই রাখা নামে লেখা দেখানো ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ২২ (বাইশ) রকম তালের উপর গরয়া নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এর সাথে প্রতিটি ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েদেরকে বিন্মি চাউলের নানা পিঠা খাওয়ানো, পাঁচন তরকারী দেওয়া সহ বিভিন্ন রকম আপ্যায়নের বস্তু দিয়ে বৈসুক উৎসব উদযাপন করা হয়। বৈসুক দিনে ধনী গরীব এবং পরিবারের বা শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ থাকে না। চেনা অচেনার কোন রকম প্রশ্ন থাকে না। এ কারণে বৈসুক উৎসবকে মহামিলনের দিনও বলা যায়। এ জন্য ত্রিপুরা পল্লীতে এ উৎসব পূর্ণ মর্যাদার সহিত তিন দিন পর্যন্ত উদযাপন করা হয়।

বৎসরের শেষ দিনের পূর্ব দিনকে বলে হরি বৈসুক, শেষ দিনকে বলে বৈসুকমা, নববর্ষকে বলে আতাদাক্। এ তিন দিন ত্রিপুরাদের মহাউৎসবের দিন।

# গুঅচেল্যা বলী

কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক বিধবা বুড়ীর ছিল সাত ছেলে। কাজে কর্মে, খেলাধুলায় এবং শৌর্যে বীর্যে তাদের তুলনা নেই। কোথাও কোন কঠিন কাজ করতে সবাই ব্যর্থ হয়েছে তো সেখানে সাত ভাইয়ের ডাক পড়ত। ছেলেদের সাফল্যে বিধবার মনে আনন্দ আর ধরে না। নিজের স্বামী না থাকুক ছেলেরা তো আছেই। এভাবে এক প্রকার মনের সুখে বুড়ীর দিন চলে যেতে লাগল।

একদিন বুড়ী তার ছেলেদের জন্য ছড়া থেকে শামুক এনে রান্না করে খাওয়াল। শামুক রান্না খেয়ে বুড়ীর সাত ছেলে বেজায় খুশী হল। ‘মাকে,- শামুক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। বুড়ী ছেলেদের জানাল যে, রান্না করা জিনিসটি সর্গ-গু ছাড়া কিছু নয়। মায়ের কাছে বিষয়টি জেনে সাত ভাই ভাবল যে, সর্গের-গু যদি এত সুস্বাদের হয় তো সর্গের মাংস আরও বেশী সুস্বাদের হবে। তাই মায়ের কাছে বায়না ধরল যে, তারা সাত ভাই একসাথে সর্গ মারতে যাবে। ‘সর্গ’ মেরে এনে সর্গের মাংস রান্না করে খাবে।

বুড়ী কিন্তু প্রথম দিকে তার ছেলেদের সর্গ মারতে যাবার সম্মতি দিতে পারল না। তবে ছেলেদের অনেক পীড়াপীড়িতে শেষমেশ রাজী না হয়েও পারল না। এদিকে সর্গ মারতে যাবার আগে বুড়ীর সাত ছেলে করল কি? সবাই তাদের মায়ের জন্য ছড়া (ছোট নদী) থেকে পানি এনে মজুদ করে রেখে দিল। মায়ের ব্যবহারের জন্য দুরের জঙ্গল থেকে তেল্যা কলার পাতা এনে ভাঁজ করে মলাট করে রেখে দিল। আর জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে মাচাংঘরের নীচে রেখে দিল। যাবার সময় মাকে বলল যে, যদি কলার পাতার রং লালচে হয় এবং ছড়া থেকে নিয়ে আসা পানিতে নাচনি পোকা জন্মায় তখন মনে করতে হবে যে, তার ছেলেদের বিপদ হয়েছে। ঐ অবস্থায় বুড়ী যাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করে, প্রার্থনা করে। একথা বলে সাত ছেলে সর্গ মারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। যেতে যেতে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় প্রথমে তারা মুখোমুখি হল এক ন’ (নৌকা)-কাবিয়ে লোকের সাথে। সাত ভাই ন’ কাবিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলঃ-

ন' কাবিয়ে ভাইরে ভাই [ অর্থাৎ নৌকা প্রস্তুতকারী ভাই সর্গ মারার পথ  
সর্গ মারা পথ কুঙ্কি যায়? কোন দিকে যায়? ]

ন' কাবিয়ে লোকটি তখন শর্ত জুড়ে দিয়ে বলল, “তোমরা সর্গ মারতে চাও তো- আগে আমাকে ন' কাবার সাহায্য করে যাও”। তখন সাত ভাই ন' কাবার কাজে সহায়তা করতে গিয়ে দেখল যে, তারা ন' কাবার গাছের উপর সাত ভাইয়ে পরপর সাত কোপ মেরেও গাছে আঁচড়ও কাটতে পারল না। তখন ন' কাবিয়ে লোকটি বলল, “তোমরা গাছের উপর আঁচড়ও কাটতে পারলে না কি করে সর্গ মারবে? তবুও যখন সর্গ মারতে যাচ্ছ এখন আর নিষেধ করেও কি লাভ”। তবু সে তাদের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সাত ভাই রাস্তা বেয়ে চলছে তো চলছেই। এবার দেখা পেল আরেক জনের। লোকটি কেরেত্ (এক ধরনের বেত) টানতে ছিল। সাত ভাই সে লোকটিকে দেখে জিজ্ঞেস করল-

‘ কেরেট তান্যা ভাইরে ভাই [ অর্থাৎ বেতসলতা টানিয়ে ভাই সর্গ মারার পথ  
সর্গ মারা পথ কুঙ্কি যায়? ’ কোন দিকে যায়? ]

ন' কাবিয়ে লোকের অনুরূপ কেরেত্‌তান্যা লোকটিও তখন কেরেত্‌ টানার কাজে সাত ভাইয়ের সাহায্য চাইল। কিন্তু সাত ভাই কেরেত্‌ ধরে টান মেরেও ঝোপ থেকে কেরেত্‌ বের করতে পারল না। তবু এই লোকটিও তাদেরকে সর্গ মারার পথ দেখিয়ে দিল।

সাত ভাই পথ ধরে চলতে চলতে এবারে উদোল তান্যা (এক ধরনের আঁশযুক্ত গাছের আঁশ ছাড়ানো রত) লোকের দেখা পেল। তাকেও ন' কাবিয়ে এবং কেরেট তান্যা লোকের মত সর্গ মারার পথ জিজ্ঞেস করল-

‘ উদোল তান্যা ভাইরে ভাই  
সর্গ মারা পথ কুঙ্কি যায়? ’

উদোল তান্যা লোকটিও উদোল টানার কাজে তাদের সাহায্য চাইল। কিন্তু সাত ভাই আশ্রাণ চেষ্টা করেও উদোল গাছ থেকে দড়ি বের করতে পারল না। তবুও উদোল তান্যা লোকটি তাদের সর্গ মারার রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সাত ভাই সর্গের সন্ধানে রাস্তা ধরে চলছে তো চলছেই। এবারে তারা দেখা পেল ‘ধ’ কবিয়ে এক লোকের। তাকে দেখে পূর্ববৎ জিজ্ঞেস করল—

‘ধ’ কবিয়ে ভাইরে ভাই  
সর্গ মারা পথ কুন্নি যায়?’

— ‘ধ’ কবিয়ে লোকটিও ‘ধ’ (একমুখ খোলা এবং অপর অংশে গ্রন্থিযুক্ত বাঁশের পাত্র বিশেষ) তৈরীর কাজে সাত ভাইয়ের সহায়তা কামনা করল। একে একে এক কোপ করে সাত ভাইয়ে সাত কোপ দিয়ে ‘ধ’ কাবার বাঁশে আঁচড়ও কাটতে পারল না। তবুও লোকটি সাত ভাইকে সর্গ মারার রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সাত ভাই পথ চলছে তো চলছেই। পথ চলতে চলতে সন্ধ্যার দিকে এক গ্রামে উপস্থিত হয়ে এক থুথুরে বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল। আসলে বুড়ীটা ছিল ডাইনি বুড়ী। তার সাথে কথিত সর্গের যোগাযোগ ছিল। সর্গের কাছে পৌঁছতে হলে বুড়ীর আস্তানা পেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় বুড়ীর বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে সাত ভাই নিজ নিজ তলোয়ার নিজেদের কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে ডাইনী বুড়ী তার আস্তানা ছেড়ে সাত ভাই যেখানে ঘুমাচ্ছিল সেখানে এসে সব তলোয়ারগুলিতে মন্ত্রপুত পানের পিক লাগিয়ে দিল। মন্ত্র পাঠ করে জিহ্বা দিয়ে লেহন করে তলোয়ারগুলির তীক্ষ্ণতা কমিয়ে ছিল। পরদিন সাত ভাই ঘুম থেকে ওঠে বুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সর্গ মারার জন্য রওয়ানা দিল। সাত ভাইকে দেখে সর্গটা বিরাট হা করে ধেয়ে আসতে লাগল। সাত ভাই সাতটা তলোয়ার দিয়ে সর্গকে উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগল। কিন্তু তাদের আঘাতে সর্গের কিছু হল না। তারা ডাইনী বুড়ীর কারসাজিতে তাদের ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কিছু করতে পারল না। এক পর্যায়ে সর্গটা এক এক করে সাত ভাইকে গিলে ফেলল।

এদিকে বিধবা বুড়ী অধীর আগ্রহে সাত ছেলের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগল। একদিন বুড়ী সত্যি সত্যি দেখতে পেল যে, তার ছেলেদের রেখে যাওয়া কলার পাতায় রং লালচে হয়ে গেছে এবং পানিতে নাচনি পোকা জন্মেছে। এতে বুড়ীর মনে আশংকা জন্মাল যে, নিশ্চয়ই তার ছেলেরা বিপদে পড়েছে। সে হতে প্রত্যেক দিন শয্যা ত্যাগ করে মুখ হাত ধুয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকল। এভাবে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বুড়ীর দিন কাটতে লাগল।

একদিন বেলা তিন প্রহরের সময় বাড়ীর সম্মুখ ভাগস্থ খোলা বারান্দা ‘চানায়’ বসে কপালে হাত দিয়ে বুড়ী ছেলেদের জন্য চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় বাড়ীর আশপাশে বিচরণরত মোরগ-মুরগী সবগুলি আতংকে চোঁচামেচি করে মাচান ঘরের নীচে জড়ো হল। বুড়ী ‘চানা’ হতে ‘ইজরে’ এসে চারদিকে তাকিয়ে গাছের উপর একটি চিল দেখতে পেল। চিলের ঠোঁটে একটা জিনিস দেখতে পেল বুড়ী। চিলকে তাড়ানোর জন্য বুড়ী একটা বাঁশের কঞ্চি ছুঁড়ে মারতেই চিলটা গাছ ছেড়ে শূন্যে উড়তে লাগল। বুড়ীর বাড়ীর উপর চক্রর মারতে মারতে এক পর্যায়ে চিলের ঠোঁট থেকে ছোট গোলাকার বস্তুটি খসে পড়ল উঠানে। তখন বুড়ী ‘ইজর’ থেকে নীচে মাটিতে নেমে এসে দেখতে পেল যে, চিলের ঠোঁট থেকে খসে পড়া বস্তুটি আর কিছু নয়— সেটি হল একটি সিগি সুপারী। বুড়ী সেটা হাতে নিয়ে নাভীর নীচে পিননের ভিতর কোমরে গুঁজে নিল। পরে উঠান ঝাট দিতে লাগল। সেদিন শরীরে অসুস্থবোধ করায় বুড়ী গোসল না করে আবার শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে তার সুপারী পাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল। ঘুম থেকে জেগে দেখে যে, তার সেই পাওয়া সুপারীটা নেই। সেদিন থেকে বুড়ী তার শরীরে পরিবর্তন লক্ষ্য করল। দেখতে দেখতে ১০ মাস ১০ দিন পর বুড়ী আরেক ছেলের জন্ম দিল। বুড়ী তার ছেলের নাম রাখল— গুঅচেল্যা। গুঅচেল্যা দিন দিন বড় হতে লাগল। খেলাধুলাসহ অস্ত্র বিদ্যায় সে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগল। গুঅচেল্যা-কে পেলেও বুড়ী কিন্তু তার আগের সাত ছেলেদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এদিকে গুঅচেল্যা ক্রমান্বয়ে শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তরতাজা যৌবনে পদার্পন করল। একদিন সে তার মাকে তার ভাই বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই— তার মা হুহু করে কেঁদে উঠল। গুঅচেল্যাকে জানাল— তার বড় সাত ছেলেদের সর্গ মারতে গিয়ে না ফেরার কথা।



মায়ের কাছ থেকে বড় সাত ভাইয়ের কাহিনী শুনে গুঅচেল্যার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল— সেও সর্গ মারতে যাবে। সর্গকে মেরে সাত ভাইকে খুঁজে বের করে আনবে। একদিন সে তার মাকে তার মনের কথা খুলে বলল। প্রথমে বিধবা বুড়ী তার ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজী হচ্ছিল না। তবুও ছেলের পীড়াপীড়িতে ছেড়ে দিতে রাজী হল।

একদিন শুভক্ষণ দেখে গুঅচেল্যা মায়ের পদধুলি নিয়ে সর্গ মারার জন্য রওনা দিল গুঅচেল্যাও যাবার পথে প্রথমে ন' কাবিয়ে লোকের দেখা পেল। তাকে সর্গ মারার পথ জিজ্ঞেস করতেই লোকটি তাকে ন' কাবার সহায়তা করার জন্য বলল। গুঅচেল্যা অনায়াসে ন' কেটে দিয়ে শেষ করে দিল। তখন ন' কাবিয়ে লোকটি খুশী হল এবং গুঅচেল্যাকে সর্গ মারার রাস্তা দেখিয়ে দিল। গুঅচেল্যা ন' কাবিয়ের পর কেরেটান্যা, কেরেটান্যার পর উদোলতান্যা, উদোলতান্যার পর, ধ' কাবিয়ে লোকের দেখা পেয়ে তাদেরকে কাজে সাহায্য করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। শেষমেশ ডাইনী বুড়ীর বাড়ীতে রাত কাটাতে পৌঁছল। ডাইনী বুড়ী পূর্বের ন্যায় তলোয়ারে পানের পিক ফেলে দিয়ে এবং জিহ্বা দিয়ে লেহন করে তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা কমানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু গুঅচেল্যা ছিল সতর্ক। সে তার পাশে তলোয়ারটা রেখে জাগরিত অবস্থায় ছিল। গভীর রাতে ডাইনী বুড়ী তলোয়ারের খোঁজে এলে গুঅচেল্যা এত রাতে কি খুঁজছে জিজ্ঞেস করলে— ডাইনী বুড়ী আমতা আমতা করে বলল, 'ত' আজু দিন্যার সুগুরী গুলুন্ধঅ তগাঙ্তে'। (তোমার দাদার আমলের সুপারীর বাটিটা খুঁজছি)।

পরদিন ভোরে শয্যা ত্যাগ করে গুঅচেল্যা সর্গ মারার জন্য রওনা দিল। গুঅচেল্যাকে দেখে সর্গটা দ্রোং-দ্রোং করে হা করে যেইনা ধেয়ে আসতে লাগল অমনি গুঅচেল্যা ধারাল তলোয়ারটা সর্গের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে নীচের দিকে জোরে চাপ দিল। সর্গের মুখ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে আসল। সর্গের পেটে একাংশ ছিল অপেক্ষাকৃত ফোলা। গুঅচেল্যা অতি সন্তর্পনে ফোলা অংশ কেটে সেখান থেকে সাত ভাইকে বের করে আনল। আশ্চর্যের বিষয় যে, সর্গ তার সাত ভাইকে হজম করতে পারেনি। সর্গের পেট থেকে সাত ভাইকে বের করে এনে সবুজ গাছের ঝোপের নীচে এনে গুশ্রম্বা করে তাদের সুস্থ করে তুলল। সাত ভাইকে নিজের পরিচয় দিয়ে মনের সুখে বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগল।

এদিকে সাত ভাইয়ের মনে দূরভিসন্ধি জন্মাল। তারা ভাবল যে, সাত ভাই সর্গকে মারতে এসে সর্গ তাদের গিলে ফেলেছে। আর তাদের সবাই ছোট ভাই গুঅচেল্যা এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে— এ হতে পারে না। এর চেয়ে লজ্জার কী হতে পারে! তারা চক্রান্ত করে একটা গর্তের ভিতর গুঅচেল্যাকে ঢুকতে বলে গর্তের মুখে একটা বিরাট পাথর চাপা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসল। এসে মাকে সর্গ মারার অলীক কাহিনী শোনাল। এদিকে গুঅচেল্যার লাঠির আঘাতে গর্তের মুখের পাথর টুকরা টুকরা হয়ে গেলে গুঅচেল্যা গর্ত থেকে বের হয়ে আসল। সে তখন ভাবতে লাগল যে, যেহেতু তার সাত ভাই চক্রান্ত করে তাকে গর্তের ভিতর ফেলে দিয়ে মুখে পাথর চাপা দিয়ে সরে পড়েছে কাজেই তাদের সাথে ফিরা সে নিরাপদ মনে করল না। সে অন্য পথে বাড়ী ফিরতে লাগল। পথ চলতে চলতে দেখল যে, এক লোক নদীর এক কূল থেকে আরেক কূলে পার হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু সাঁতার না জানায় সে পার হতে পারছিল না। তখন গুঅচেল্যা-বলী তাকে এক কূল থেকে আরেক কূলে নিক্ষেপ করল। সে নিজে দৌড়ে এসে এক লাফে নদী পার হল। এতে লোকটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, “এ কেমন বীর” তখন গুঅচেল্যা বলল,— “আমি কি বীর, শুনেছি— গুঅচেল্যা-বলীই বীর।” আসলে লোকটা জানত না— সেই গুঅচেল্যা-বলী।

আরেক জায়গায় এসে গুঅচেল্যা দেখল যে, কিছু লোক একটা ছড়ায় বাঁধ দিয়ে পানি সৈঁচে— মাছ, কাঁকড়া ধরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পানির স্রোত বন্ধ করা যাচ্ছিল না। গুঅচেল্যা নিজের দুই পা জড়ো করে বসে নদীর স্রোত বন্ধ করে দিলে লোকজন পানি সৈঁচে— মাছ, কাঁকড়া ধরতে সক্ষম হল। তখন সবাই গুঅচেল্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ও মা! এম্মা কী বীর! অর্থাৎ মাগো! এত বড় বীর। তখন গুঅচেল্যা বলল, “আমি কী বীর, গুঅচেল্যা-বলীই নাকি আসল বীর। এরাও জানত না যে, সেই গুঅচেল্যা-বলী।

পরে গুঅচেল্যা বলী— বাড়ীতে এসে পৌছল। বাড়ী এসে দেখে যে, তার সাত ভাই অঘোর ঘুমে মগ্ন। মার পদধূলি নিয়ে গুঅচেল্যা সর্গ মারতে যাওয়ার পথের বিস্তারিত ঘটনাবলীসহ সর্গ মারার কাহিনী মাকে শুনাল। মা বেজায় খুশী হয়ে আশীর্বাদ করল। মা সাত ছেলেকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে গুঅচেল্যার সাথে

তাদের পরিচয় করে দিল। সাত ভাই তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হল এবং মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে গুঅচেল্যাকে জড়িয়ে ধরল। সে হতেই গুঅচেল্যা সহ সাত ভাই তাদের মাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

[বিদ্রঃ- কথিত আছে যে, চাকমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত গুঅচেল্যা বলীর মত পরাক্রমশালী বলী আর জন্মায়নি। তাই কোন বলীর নাম বেশী ছড়িয়ে পড়লে বলা হয়ে থাকে- লোকটা কি গুঅচেল্যা হয়েছে? -এ কথা এখনো চাকমা সমাজে বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে মুখে বলতে শোনা যায়।]

---

[জনাব কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, রাঙ্গামাটি।]

# অরণ্য পাহাড় নদীর মায়ায়

মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া

আমার একদিকে রাজ্যমাটি  
আর একদিকে খাগড়াছড়ি  
মাঝখানে চেকী নদী  
যায় বয়ে যায় ।

আলুটিলা থেকে ফুরমোন  
ফুরমোন থেকে চিম্বুক, উত্তিগ্ন যৌবন  
পাহাড় অরণ্য ঝর্ণার কলতান  
আজন্ম আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে  
এক মোহময় ভালবাসায় আমি হেঁটে যাই  
সুবলং, বরকল থেগা কোক্কাং  
মাইনী, কাসালং, মাসালং, সাজেক ভেলী  
তৈমিদং, চারিক্ষ্যং, খারিক্ষ্যং বন্দুকভাঙ্গা  
পাখীর কলকাকলী মুখরিত জনপদ  
চাকমা, মারমা, লুসাই, বম, থিয়াং  
নিত্য কোলাহল, বৈসাবি বিজু  
আজন্ম ভালবাসার অধিকার  
আমার একদিকে চিৎমরম  
আর একদিকে চিম্বুক  
মাঝখানে সাংগু নদী  
যায় বয়ে যায় ।

---

[জনাব মঈন উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রধান শিক্ষক, সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজ্যমাটি ।]

# আমার জানা বিউ পরব

হীরারাগী বড়ুয়া

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা সনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ‘পহেলা বৈশাখ’ নববর্ষ হিসাবে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে। পুরাতন বছরকে বিদায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যেই এই উৎসবের আয়োজন।

বাংলাদেশের সমতল এলাকায় বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ‘বড়ুয়া’ জনগোষ্ঠীও মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে পুরাতন বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করে আসছে যা ‘বিউ পরব’ নামে আখ্যায়িত। ‘বড়ুয়া’ সমাজে ‘বিউ পরব’ এক আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার ও সৌহার্দপূর্ণ্য পরিবেশে পালন করা হয়।

বৈবাহিক সূত্রে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার বালুখালী গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়ী; গ্রামের নিয়ম আছে বিয়ের প্রথম বছর নতুন বৌকে ‘বিউ পরব’ এর সময় শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে হয়। ‘বিউ পরব’ উপলক্ষ্যে বৌ এর বাপের বাড়ী থেকে নানা খাবার দাবার শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাতে হয়। সেই নিয়ম রক্ষার্থে আমাকে ৯৫ -এর ‘বিউ পরব’ শ্বশুর বাড়ী বালুখালী গ্রামে পালন করতে হয়েছে। ঐ সময়ে ‘বিউ পরব’ উৎসবে আমি যে নতুনত্ব, আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা আমার এই লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

‘বিউ পরব’ উৎসবটি বড়ুয়া জনগোষ্ঠী কখন থেকে পালন করে আসছে তার সঠিক সময় কারো জানা নেই। তবে এটি একটি সামাজিক উৎসব, পাশাপাশি ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করতে দেখেছি।

সাধারণত চৈত্র মাসের শুরুতেই ‘চৈত ঘাটা বাঁধার’ মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা। চৈত্র মাসের ২৯, ৩০ ও বৈশাখে ১ তারিখ নিয়ে মোট ৩ (তিন) দিন ‘বিউ পরব’ পালিত হয়। এই তিন দিনের নামকরণ হলো- (১) ফুল বিউ/ ফুলতোলনী (২) মূল বিউ (৩) নতুন বছর।

ইংরেজী ক্যালেন্ডরের পাতায় এপ্রিল এলেই গ্রামের বৌ-ঝি-দের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কারোর অবসর নেই। ‘বিউ পরব’ আয়োজনের কাজ আর কাজ। ছোট বাচ্চাদের মুখে শোনা যায় নতুন জামা কাপড়ের কথা, বেড়ানোর কথা, দিন গণনার কথা আর কত দিন বাকী আছে পরবের? গ্রামের বউ-ঝিয়েরা ‘বিউ পরব’ কে সামনে রেখে প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে বিশেষত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে। সারা বছর ধোয়ামোছা করলেও ‘বিউ পরব’ উপলক্ষ্যে আলাদা ধোয়ামোছা করা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বিছানাপত্র, কাপড় চোপড়, ঘরের নানান জিনিসপত্র যা ধোয়া যায় সব ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ফেলে। ঘরের আনাচে কানাচে ভাঙা জিনিস, ময়লা, ছেড়া, আবর্জনা ঝেড়ে পরিস্কার করে ফেলে। মাটির ঘর, চূলা লেপা, মোছা করে বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সারা করে। অর্থাৎ পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুন ভাবে ভাবিস্যত জীবন শুরু করার অঙ্গীকার করা।

তারপর ঘরে ঘরে খাবার দাবারের আয়োজন এর কাজ শুরু করে। চিড়াকুটা, খই, আটকরই ভাজার ধুম পরে। ভোরে ঘরে ঘরে ‘পটাফট পটাফট’ খই ভাজার শব্দ, টেকিতে চিড়া কুটার শব্দ শোনা যায়। দুপুরে সবাই দল বেঁধে খই (ভাজা) এর থেকে ধান বেছে ঝেড়ে ছাতু করার কাজ শেষ করার কাজে ব্যস্ত থাকে, তার সাথে বিভিন্ন গল্প গুজব। মোটামুটি সাজ সাজ রবে মুখরিত চারিদিক। বউ ঝিয়েরা খই চাল ভাজার ছাতু দিয়ে এক একদিন পালা করে একে অপরের লাবন ও নাড়ু তৈরীর কাজে সহায়তা করে। এতে একের প্রতি অপরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রাণবন্ত মনোভাব সকলকে বিশেষভাবে একত্রিত করে। এই বিষয়টা আমার ভীষন ভাল লেগেছে।

আগেই উল্লেখ করেছি খাবার দাবারের তালিকায় থাকে— আটকরই, লাবন বা নাড়ু, খই, চিড়া, দই, কলা, গুড়, মিষ্টান্ন, পাঁচন ইত্যাদি প্রধান।

আটকরই— আটকরই হলো একপ্রকার চাল ভাজার সাথে আট থেকে উর্ধে যত প্রকার ডাল, বিচি আছে তা ভেজে মিশিয়ে পাঁচমিশালী করে তৈরী করা হয়। এই আটকরই গ্রামে মজার ও জনপ্রিয় খাবার।

লাবন বা নাড়ু—চিড়া, মুড়ি, খই —এর নাড়ু তৈরী করা হয়। বিশেষত খই ও চাল ভাজা গুড়া করে ছাতু করা হয়। ছাতুর সাথে গুড় মিশিয়ে বিভিন্ন খাবার তালিকায় থাকবে। কারণ বছরের ‘বান’ দিতেই হবে। এই বিষয়ে গ্রামে সংস্কার

আছে। খই এবং চাল ভাজার গুঁড়ার সাথে গুড় মিশিয়ে একত্রে এক একটি লাবন তৈরী হয়। তেমনি একটি পরিবারও যাতে নতুন বছরে একে অপরের সাথে সুখে দুঃখে মিলেমিশে একত্রে দিন কাটাতে পারে সেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। লাবনকে একতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় লাবন যেই ঘরে বানাবে সেই ঘরের কোন ছেলেমেয়ের জন্মবার যাতে না পরে, অর্থাৎ কারো জন্মবার নেই এমন দিন নির্বাচন করে গৃহস্থদের প্রথম লাবন তৈরী করতে হবে।

### এবার আসা যাক ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার কথায়।

প্রথম দিন ফুল-বিউ/ ফুল তোলনী- ফুল বিউ'র আগের দিন বিকেলে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা 'জাঁক' কুড়ায়, জাঁক হলো বিভিন্ন ধরনের কাঁটা জাতীয় লতাপাতা। যেমন- বেতগাছের পাতা, কেয়াপাতা, বিষকাঁটালী, নিমপাতা ইত্যাদি। কাঁটায়ুক্ত গাছ বা ঐ গাছের পাতাকে অশুভের প্রতীক এবং নিমপাতাকে রোগ মুক্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। কুড়ানো লতাপাতা উঠানের মাঝখানে রাখা হয়। ফুল বিউ'র দিন খুব ভোরে ওঠে ঐ কুড়ানো 'জাঁকে' আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘরের বউ, ঝি, পুরুষ, বাচ্চা সবাই আগুন ধরানো 'জাকের' চারপাশে ঘুরে ঘুরে ধোঁয়া গায়ে লাগায় আর ছড়া কাটে-

‘জাঁক জাঁক আমাদের ঘরে জাঁক

টাকা পয়সা, ধন সম্পদ আমাদের ঘরে জাঁক।

সুন্দর সুন্দর বউ, জামাই আমাদের ঘরে জাঁক।

রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট সব (দজর্যা) সাগর পার হয়ে যা।

মশা, মাছি পোকা-মাকর সব পুড়ে মরে যা।

এই জাঁক পোড়ানোর মাধ্যমে শরীরে রোগমুক্তি, ধন সম্পদ ও পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে থাকে। ২ দিন জাঁক পোড়াবে নতুন বছরের দিন সব পানিতে ফেলে দিয়ে অতীতকে বিদায় জানিয়ে নতুন দিনকে আহ্বান জানাবে।

‘জাঁক’ এর ধোঁয়া গায়ে লাগিয়ে ছেলেমেয়েরা ফুল তুলতে বেরিয়ে পরে। বিভিন্ন ধরনের ফুলের সাথে নিমপাতা তুলে আনে। সেই সময় এক ধরনের সাদা থোকা থোকা জংগলী ফুল ফোটে। যা গ্রামে বিউ-ফুল নামে পরিচিত। বিউ-ফুলও তুলে আনবে। সবাই স্নান করে ফুল ধুয়ে কেয়াং ও ঘরে রক্ষিত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করে প্রার্থনা করবে। কেয়াং -এ বুদ্ধ মূর্তিকে ফুল নিবেদনের পূর্বে ডাবের

পানি দিয়ে স্নান कराবে। তারপর ফুলের মালা দিয়ে ঘর সাজাবে। ঘরের দরজা, জানালায় নিমপাতাসহ ফুলের মালা ঝুঁজে দেবে। গরু-ছাগলকে স্নান করিয়ে ফুলের মালা গলায় পরাবে। ঘরের বিভিন্ন জিনিসে (ধানের গোলা, বাস্র পেটরা আলমিরা) একটি করে ‘বিউ-ফুল’ বেঁধে দেবে। এই ভাবে ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে পুরাতন বছরকে বিদায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে ‘ফুল-বিউ’র দিন অতিবাহিত করে।

**মূল পরব-** বছরের শেষ দিন মূল পরব। খাওয়া দাওয়ার দিন। ভোরে উঠে উঠান ঘাটা ঝাট দিয়ে সোনা, রূপা, কাঁচা হলুদ ডুবানো পানি দিয়ে ঘরের চারপাশ পবিত্র করবে। বাড়ীর সবাই ঘিলা ও হলুদবাটা গায়ে মেখে স্নান করে পুরাতন বছরের মলিনতা দূর করবে। তারপর ঘরের বউ-ঝিয়ারা মিলে রান্না বান্নার কুটা-বাছার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরবে। রান্নার তালিকায় পাঁচন-মিষ্টান্ন প্রধান বস্তু। পাঁচন হচ্ছে নানা রকমের তরিতরকারী আর তিতা, মিঠার সংমিশ্রনে পাঁচমিশালী সবজী তরকারী। সম্পূর্ণ নিরামিষ সবজীর তরকারী। বিশ/ ত্রিশ রকমের সবজীর মিশ্রণের তরকারী পাঁচনের স্বাদ ও গুণ অপূর্ব। পাঁচন সবার বাড়ীতে থাকবে। ‘পাঁচন খেয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে বৌ-ঝিয়ারা কার বাড়ীর পাঁচন কেমন স্বাদ হয়েছে, কে কত প্রকার সবজী মিশিয়েছে সে বিষয়ে আলাদা করে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। গ্রামে সবার বিশ্বাস ‘বিউ’র পাঁচন স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। এর মজা ঐ দিন ছাড়া আর কখনো পাওয়া যায় না। সত্যি যায়ও না। বিউ’র পাঁচন খেলে শরীর সুস্থ থাকে। ঐ দিন যদি কারো জন্মবার হয় তবে তাকে সাত ঘর থেকে ভিক্ষা করে পাঁচন খেতে হয় এতে ঐ ব্যক্তির মঙ্গল হয়। এই ভিক্ষা করে পাঁচন খাওয়ার দৃশ্যটি আমার খুব ভাল লেগেছে। সাধারণত এই দিনে কাউকে নিমন্ত্রণ করতে হয় না। সবার জন্য দুয়ার খোলা। অতীতের দোষ ত্রুটি ভুলে একে অপরের সহিত কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের বাড়ীতে যাবে। প্রত্যেকে আয়োজিত খাবার দিয়ে অতিথিদের করবে। এইভাবে মূল পরব অতিবাহিত হয়।

তারপর দিন নতুন বছর পহেলা বৈশাখ। এই দিনও স্নান পর্ব সেরে নতুন জামা কাপড় পরে ছোয়াইং নিয়ে কেয়াং -এ যাবে। সমবেত ব্যক্তির পঞ্চাশীল গ্রহণের মাধ্যমে নতুন বছরের শুভ কামনা করে প্রার্থনা করে ভগবান তথগত বুদ্ধের কাছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করে মৃত পূর্ব পুরুষের শশ্মানে গিয়ে শশ্মান ধুয়ে



মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে আশীর্বাদ কামনা করে। পরে ঘরের বয়স্কদের পানি দিয়ে পা ধুয়ে শ্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। যাতে নতুন বছরের আগত দিনগুলি শুভ ও মঙ্গলময় হয়।

বছরের পহেলা দিন ঘরে ঘরে মাছ, মাংস, মিষ্টি নানা ধরনের ভাল খাবার দাবারের আয়োজন করে। নতুন দম্পতিদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। মা- বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে বলে যাতে সারা বছর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় মনোযোগী হয়, কারর সহিত ঝগড়া, বিবাদ করা থেকে বিরত থাকে। সংস্কার আছে বছরের প্রথম দিন যদি শুভ ও সুন্দর নির্বাঞ্ছাটে কাটে, তবে আগত বছরের সব দিন ভাল কাটবে। পুরাতন দিনের মলিনতা, দৈন্যতা পিছনে ফেলে নতুন আশা-আকাজ্জা বুকে নিয়ে সব কিছু নতুনভাবে শুরু করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

বছরের প্রথম দিন গ্রামে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজনও করা হয়। বিশেষত- হা-ডু-ডু, বলি খেলা, গরুর লড়াই, দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি ইত্যাদি।

এইভাবে যুগ যুগ ধরে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার বড়ুয়া জনগোষ্ঠী 'বিউ পরব' উৎসব পালন করে আসছে। কালের আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাস্তবতার কারণে পরিবেশে হয়তো অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যে এক ও অভিন্ন রয়ে গেছে তা হলো জীর্ণতা, দৈন্যতার বিষয়ে আলাদা করে অতীত ভুলে নতুন বছরে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সুখ, সমৃদ্ধি, গৌরবে বুদ্ধের সাম্যের পতাকাতলে একত্রিত হয়ে পথ চলা।

---

[ হীরা রাণী বড়ুয়া, লাইব্রেরিয়ান কাম মিউজিয়াম এসিস্টেন্ট, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি । ]

# ভালবেসে ফিরে যাবো

শ্যামল তালুকদার

জীবনের প্রায় অর্ধশত বৎসর এসেছি পেরিয়ে  
এরই মাঝে যা' কিছু করেছি সঞ্চয়,  
বিশ্মৃতির অতল তলে কিছু তার গিয়েছে হারিয়ে  
বাকীটুকু এ' জীবনে নেই হারাবার ভয় ।

পাওয়া- না পাওয়ার এই জীবনে  
সমূখের পানে কেবলই পথ বেয়ে চলা,  
কখনো বা আমি ভাবি মনে মনে  
আরো কিছু আছে কি যা' এখনো হয়নি বলা ।

অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র কথাগুলি জমা হ'তে হ'তে  
বক্ষ তলে স্থির, অচঞ্চল পাহাড়ের মত-  
জীবনের মুহূর্তগুলি দ্রুত চলে যায় বন্ধুর পথে  
আঘাতে আঘাতে পূর্ণ করি' মর্ম ক্ষত বিক্ষত ।

পৃথিবী কাঁপিতেছে সদাই সবলের দম্ভ ভারে  
দুর্বলের স্থান যেন কৃপা আর করুণায়-  
দেখিতেছি, পৃথিবী ডুবিতেছে এ' কোন অন্ধকারে  
আলো জ্বালিবার, হয় যেন হেথা কেহ নাই ।

তবুও জীবন এখানে থাকে না থেমে,  
সমূখের পানে ছুটে অবিরাম নিরবধি,  
বাঁধা যদি সমূখে এসে পড়ে নেমে  
নদী তবু ছুটে যায় সমূখের সাগর অবধি ।

নদী হয়ে আমি অবিরাম বয়ে যেতে চাই  
সমুখের সাগর আমারে যে ডাকে,  
দুখের চিহ্নগুলি স্রোতে ধূয়ে মুছে যায়  
মরণের পরে কেবা করে মনে রাখে?

যেথা হতে আমি হেথা আসিয়াছি—  
ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়,— নয় অর্থ রাশি রাশি,  
জগতের সৌন্দর্য সুধা যতটুকু আকণ্ঠ পান করিয়াছি—  
সেথা ফিরে যাবো আমি তোমাদেরে ভালবাসি ।

জীবনের যতটুকু বাকী পথ হেঁটে যেতে হবে  
আজিকার মত তোমাদেরে ভালবাসিবারে চাই;  
যেতে যেতে এই পথ চল থেমে যাবে যাবে  
এই ভালবাসা যেন কোথাও কভু না ফুরায় ।

এই মাটি এই জল এই ফুল পাখি চাঁদ  
এই নদী এই নীল গ্রহ নক্ষত্র রাশি রাশি—  
ভালবেসে কভু কি কার মিটিয়াছে সাধ—  
ভালবেসে যাবো আমি হেথা ফিরে আসি’ ।

স্মৃতি হয়ে জমা থাক বেদনার ক্ষত চিহ্নগুলি  
যত সুখ আছে প্রাণে সব ধূয়ে মুছে যাক,  
বেদনার মাঝে এ’ জীবন ভরিয়া তুলি’  
বিদায় নেবো— যখনই আসিবে সুদূরের ডাক ।

---

[ জনাব শ্যামল তালুকদার (অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী), বি.এ.ডিসি, রাঙ্গামাটি ।]

# গুম্‌চাক জোক্‌মা (চিনার কুমারী)

সুরজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা

[গুম্‌চাক জোক্‌মা :- জুমে চিনার জাতীয় একপ্রকার ফল, যা স্থানীয়ভাবে ‘চিন্দ্রিরা’ নামে পরিচিত। ত্রিপুরা ভাষায় এর নাম গুম্‌চাক-ফলের ন্যায টুকটুকে লাল ও খুব সুন্দর যে মেয়ে তাকে ‘গুম্‌চাক জোক্‌মা’ বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে]

‘সাকা পাড়ার’- (উপরের পাড়া) খুমতাইরুংফা জুম চাষী হলেও অবস্থা সম্পন্ন লোক। প্রতি বছর জুম থেকে প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ আড়ি (২০০ থেকে ২৫০ মণ) ধান ঘরে তুলেন তিনি। তাছাড়া শ’ দেড়শ’ আড়ি তিল হয়; তুলা হয় প্রায় ৩০/৩৫ মণ। অন্যান্য ফসলের মধ্যে কচু, মেটে আলু, কুমড়া ইত্যাদি প্রচুর হয়ে থাকে। শুকর আছে ছোট-বড় প্রায় ৮/৯ টা।

এক মেয়ে তিন ছেলের মধ্যে মেয়ে খুমতাইরুং স্বশুর বাড়ীতে আর দু’ছেলে বিবাহিত। তাদের আবার প্রত্যেকের দু’তিন জন করে ছেলে-মেয়ে আছে। সুতরাং খুমতাইরুংফার পরিবারে সদস্য সংখ্যা বার-তের জন। তাছাড়া বাইরের থেকে প্রায় সময় দু’তিন জন কাজের লোক থাকে। থাইতাকফা সবার ছোট ছেলে। যার আসল নাম হাচোক। বয়স ২২/ ২৩ বৎসর; অবিবাহিত যুবক।

ভাদ্রমাসে জুমে ধান কাটা, মাড়া, ঝাড়া অর্থাৎ ফসল তোলার ধুম লেগে যায়। জুমে ধান মাড়াইয়ের পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। জুম চাষ হলো পাহাড়ে জঙ্গল কেটে মিশ্র ফসলের চাষ। কাজেই পাহাড়ের ঢালুতে এক বিশেষ কায়দায় শক্ত মাচাং তুলে তার উপর বড় সড় ‘মুং’ (ধান রাখার পাত্র বিশেষ) বসানো হয়। মুং-এর ভিতরের দিকে একটা বড় কাঠের পিঁড়া বুলিয়ে বাঁধা হয় যেখানে ধানের মুঠো মুঠো আঁটিগুলো ধরে আছড়িয়ে আছড়িয়ে ধান ঝরানো হয়। এটাকে ‘মুং বুনাই’ বলে।

দু'চার দিন আগে পাকা ধান কেটে মুঠো মুঠো আঁটি বেঁধে সারা জুমে ছড়িয়ে রাখা হয় যেন ভাদ্রের কড়া রোদে শুকিয়ে যায়। দু'বড় ভাই- বদলা বদলী করে ধান পেটাচ্ছে অর্থাৎ ধান ঝরাচ্ছে; থাইতাকফা আর বৌদিরা সারা জুমে ছড়িয়ে রাখা শুকনো ধানের আঁটিগুলো কুড়িয়ে এনে 'মুং' এর পাশে রেখে যাচ্ছে। এভাবে তাদের মধ্যে একটা অনাবিল আনন্দের প্রতিযোগিতা চলে। একজন ধান পেটাচ্ছে, অন্যেরা আঁটিগুলো কুড়িয়ে এনে যোগান দিচ্ছে; কিন্তু যোগান দেয়া কুলিয়ে উঠতে পারছে না তিন চার জনে। ভাদ্রের কড়া রৌদ্র। সবার গায়ের জামা কাপড় ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। বৌদিদের গাল হয়ে গেছে পাকা আপেলের মত টুকটুকে লাল। এত পরিশ্রমের মাঝে বৌদিরা মাঝে মাঝে খিল খিল করে হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছে। এভাবে কিছুক্ষণ প্রতিযোগিতার পর 'মুং' ধানে ভরে যায়। তখন সাবাই বসে বিশ্রাম নেয়, তামাক খায়, চিন্দিরা খায়, জল খায়। একেবারে তরতাজা ঝর্ণার জল, স্বচ্ছ, শীতল জল। কেউ বা মারফা, চিন্দিরা খেতে থাকে। এগুলো তাদের একেবারেই নৈমিত্তিক ব্যাপার। মা- বাবারাও একেবারে বসে নেই। বাবার হাতে একটা ঢোল আর কয়েকটা লাই নামক ঝুড়ি বুনার কাজ আছে। সেগুলো বুনতে বসেছেন। মা নাতি-নাতনীদের দেখাশুনা করার ফাঁকে রান্নার, ঘষা মাজার কাজটা সারিয়ে ফেলছেন। বিশ্রামের পর 'মুং' এর ভিতর ঝরানো ধানগুলো নিয়ে টংঘরে রক্ষিত গোলায় নিয়ে জমা করে সবাই। ভাদ্রের দিনগুলো তাদের এভাবে ব্যস্ততায় কাটে।

একদিন এক পড়ন্ত বেলায় এভাবে ধান কাটতে কাটতে থাইতাকফা একটা সুন্দর টুকটুকে লাল মসৃণ পাকা 'গুমচাক বাথাই' (জুমে উৎপাদিত এক জাতীয় চিনার) পায়। সে সেটা তুলে নিয়ে বৌদিদের দেখিয়ে বলে- 'বাঁচে, গুমচাকটা কত সুন্দর দেখ! বৌদিরা খুব ব্যস্ত হয়ে ধান কাটছে আর আঁটি বেঁধে রেখে যাচ্ছে। রোদে তাদের গালও ঐ গুমচাকের মত রাঙা হয়ে ওঠেছে। গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। ঘামে ব্লাউজ পর্যন্ত ভিজে একেবারে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। মাঝে মাঝে 'রিসা' (মহিলাদের বক্ষ-বক্ষনী, ফুল তোলা এক ফালি কাপড় যা 'খাদি' নামে পরিচিত) দিয়ে ঘাম মুছছে। এত ব্যস্ততার মাঝেও তারা একবার চোখ তুলে থাইতাকফার দিকে তাকায়। বড় বৌদি একটু মচুকি হাসি দিয়ে আবার কাজে মন দেয়। মেজো বৌদি কাস্তে দিয়ে হাত চালাতে চালাতে (ধান কাটতে কাটতে) বলে হাঁ, খুব স্বাদ হবে, তাই না? এদিকে দাও, খুব তেষ্ঠা পেয়েছি, খেয়ে ফেলি।

থাইতাকফা ঠাট্টাচ্ছিলে বলে- সর্বনাশ, খাবে কি? আমার জন্য এ গুমচাকের মতো সুন্দর রঙের বৌ আনতে হবে যে! এটা নিয়েই তো আমি কনে দেখতে যাবো। বলে হা হা করে হেসে ওঠে।

বৌদিরা তখন ঠাট্টা করে বলে- হতভাগা, তুমি একটা কালো মানিক, এরকম টুকটুকে লাল কোন পোড়া কপালি তোমাকে পছন্দ করবে শুনি? এভাবে কৌতুক করতে গিয়ে বৌদিদের সাথে কাজ করতে করতে সত্যি বাজি ধরা ধরি হয়ে যায়। থাইতাকফা বলে, ঠিক গুমচাকের মতন একটা বৌ আনতে পারলে তোমরা কি পুরস্কার দেবে বল?

বৌদিরা হাসতে হাসতে বলে তাকে আর চুলোয় যেতে হবে না, কাপড়-চোপড় ধুতে হবে না, জল তুলতে হবে না--- ইত্যাদি; আর কি চাই বলো? আর যদি আনতে না পার তবে ---- ?

থাইতাকফা বলে- তবে বিয়েই করবো না!

সারা জীবন ?

সারা জীবন ---।

সত্যি ?

সত্যি সত্যি সত্যি! হাতের তালুতে তালুতে থু থু দিয়ে তারা পরস্পরের হাতে চাপড় মারে।

দিব্যি তো হয়েই গেল। এখন থাইতাকফার কনে খোঁজার পালা। তার আর ধান কাটা হলো না। গুমচাক বাথাইটা যত্ন করে এনে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ঘরে ফিরে মায়ের কাছে ভাত চেয়ে খেল। তারপর কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে, একটা মুলি বাঁশের বাঁশী আর 'রাইদাং চাকাকসা' (লাল বেতের লাঠি) হাতে করে মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল। আপাতত মা-বাবাকে কিছু জানতে দিল না। কেবল বলে গেল,- 'একটু ঘুরে আসি; দু'এক দিন দেরীও হতে পারে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প,- এমন বৌ পেলে ফিরব, না পেলে আর ফেরা হবে না।

ক' দিন ধরে সে এপাড়া ওপাড়া ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে চলে গেল। কোন সুন্দরী যুবতী দেখলে সে তার কোলা থেকে গুমচাক বের করে মিলিয়ে দেখে নেয় আর মনে মনে বলে 'সুন্দর, তবে আমার গুমচাকের মত নয়। আবার আপন মনে ফিক্ করে হাসেও। ভাবে 'আমি কত বোকা! মানুষ কি ঠিক একটা ফলের মত হয়? কিন্তু বৌদিদের সাথে বাজি ধরেছি --- ! না পেলে তো আর ঘরে ফেরা হবে না --- ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে একদিন ধরে পথ চলার শ্রান্তিতে সে অনেকটা ভেঙ্গে পড়ছিল। তবুও হাদোক পাড়া, পাড়া গিরা, পাড়া গরজা, তকলা কিচিয়াপাড়া, গগালা পাড়া, চৌক পাড়া, হাপিলিং পাড়া ইত্যাদি ঘুরে একদিন এক গৌধূলি ক্ষণে এক ঘাটে গিয়ে পৌঁছল সে। ঘাটে দুই তরুণীর একজন সদ্য স্নান সেরে পরনের কাপড় ও বক্ষবন্ধনী কাপড় রিনাই-রিসা বদলাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গাইছে। অন্যজন কাপড় চোপড় বদলিয়ে 'তিলকে' করে কুয়ার জল নিয়ে কলসীতে ভরছে। ('তিলক'- একপ্রকার ছোট জাতের লাউয়ের খোল)। তাদের উভয়কে দেখে থাইকাতফা এতদিনের পথ চলার ক্লান্তি, দেহের, পোষাকের সমস্ত মলিনতার কথা ভুলে কিছুক্ষণের জন্য মত্ত মুগ্ধের মত অপলক দৃষ্টিতে একে একবার, ওকে একবার দেখতে লাগল। যুবতীরা যে যার কাজে আপন মনে ব্যস্ত। যে কাপড় পাল্টাচ্ছে হঠাৎ তার চোখ নবাগত যুবকের উপর গিয়ে পড়াতে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে 'অ বৈ --- ! (ও দিদি --- !) বলে লজ্জায় নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করে। দিদি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অপরিচিত যুবক। তার মুখের গুণ গুণ সুর থেমে যায়। মূহুর্তের জন্য সেও লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। আগন্তুক থাইতাকফার মনে হলো গৌধূলির যে রাঙা আবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা যেন এ দু'বোনের লজ্জা রাঙা মুখ থেকে ছড়াচ্ছে ! সে মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে। ওদিকে দু'বোন ফিস ফিস করে কি সব বলাবলি করছে ---। তারা যুবকের মলিন চেহারা, উস্কো খুস্কো চুল আর হাবা-গোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে অপলক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে খিল খিল করে হেসে ফেলে। তখনি থাইতাকফার সম্মিৎ ফিরে আসে এবং নিজের মলিন চেহারার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু লজ্জাবোধ করে। বলে 'অনেক দূর থেকে এসেছি তো, তাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। 'ববই লখিরওক্ (লক্ষী দিদিরা), আমাকে একটু ঠান্ডা জল দেবে কি?

বড় বোন তখন কুয়া থেকে 'তিলকে' করে ঠান্ডা জল নিয়ে যুবকের দিকে এগিয়ে দেয়। ভরা যৌবন তার অঙ্গে। অন্যদিকে লজ্জা রাঙা মুখ। যুবককে সে

সরাসরি চোখাচোখি তাকাতে পারেনি। অবনত দৃষ্টিতে সে জল এগিয়ে দেয়। আড়ষ্ট ভঙ্গিমা। এদিকে থাইতাকফা যুবতীদ্বয়ের রূপের ছটায় মোহিত। তার উপর এ যুবতীর লজ্জাবনত আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় জল এগিয়ে দেওয়া, তার হৃদয়কে মূহুর্তের জন্য মুগ্ধ করে দেয়। অবাক বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণের জন্য বিহবল হয়ে পড়ে। যুবতী তখন ছোট্ট করে ডাক দেয় ‘দাদা, জল ---! সে তখন তাড়াহুড়ো করে ‘তিলকটা’ নিয়ে দুক্ দুক্ করে জল পান করে। বলে ‘বাহ, তিলক্ তৈ চাকাং কাচাং জিনবা ববই নি যাকনি তৈ ন পাইয়া (আর্থঃ তিলকের জল ঠান্ডা জানি, কিন্তু দিদির হাতের জলের মত নয়) ! খুউব ধর্ম পাবে ! এ কথায় বড়বোন মুখে হাত দিয়ে ফিক্ করে হেসে শুধায়, সেটা কি দাদার ঝোলায় ভিতর আছে --- ? থাইতাকফা বুঝে উঠতে পারে নি। জিজ্ঞেস করে কি? বলে যুবতীর দিকে তাকায়। এই যে তুমি বললে ‘ধর্ম পাবে - -- ? যুবতী বলে। এভাবে কথোপকথনের ফলে তাদের মধ্যে কিছুটা সংকোচভাব কেটে যায়। পরক্ষণে আলাপরত বড় বোন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, যাকগে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল বলে; আমাদেরও দেরী হয়ে যাচ্ছে। ছোট বোনকে বলে- গিরা (ছোটো), তাড়াতাড়ি চল। আমি অতিথিকে নিয়ে আসছি। দাদা, এ সন্ধ্যায় আর কোথায় যাবে? আমাদের বাড়ীতে থাকবে’ এই বলে অতিথিকে তাগিদ দিলে- দাদা স্নানটা সেরে ফেলো, আমি ততক্ষণে ওখানটাই অপেক্ষা করবো, এই কথা বলে সে ঘাটের কাছে একটা বেল গাছ আছে তার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ওদিকে আগন্তুক (থাইতাকফা) তার ঝোলা থেকে কাপড় চোপড় বের করতে গিয়ে ‘গুমচাক’টা আরো একবার ভাল করে দেখে নেয় এবং দু’বোনের সাথে তুলনা করতে চেষ্টা করে। ছোট বোন-কে তার অবিকল গুমচাকের মত মনে হয়! যাহোক মনে মনে সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং তার উদ্দেশ্য করজোড়ে করে প্রণতি জানাই আজকের এই শুভ মিলনের জন্য। সে তাড়াতাড়ি স্নান করে কাপড়-চোপড় পরে নিলে; বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নিজের বানানো সুন্দর চিরুণী বের করে চুল স্টাইল করে আঁচড়ালে, আর প্রসাধনী সামগ্রী যা যা ছিল গায়ে মেখে তরতাজা হয়ে অপেক্ষামান বড় বোনের অনুগামী হলো।

এদিকে ছোট বোন আগে ভাগে এসে বাড়ীতে জানিয়ে দিলে, অতিথি আসছে--। কাজেই আপ্যায়নের যথাযোগ্য আয়োজন শুরু হয়ে গেল। (এখানে উল্লেখ্য যে এতদঞ্চলের ত্রিপুরা সমাজে সাধারণতঃ বিবাহযোগ্য ছেলে জীবন সঙ্গী



বেছে নেবার খোঁজে বের হত এবং যেখানে যে বাড়ীতে উপযুক্ত যুবতী থাকে সেখানে গিয়ে রাত যাপন করত। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হত, জানাজানি হত, ঘনিষ্ঠতা হত। এক্ষত্রে পিতা-মাতা অভিভাবকেরা উৎসাহ বোধ করত এবং যুবকের গুণাবলী যাচাইয়ের জন্য ক'দিন বাড়ীতে থাকার সুযোগ করে দিত। তখন যুবক এ বাড়ীতে থেকে জুমের কাজে, বেত তোলা, নানা (ডিজাইনের) কারুকার্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি (লাই, কাবাং-বড় থুরুং, ফালা- নিত্য ব্যবহারের ঝুড়ি, রি-খুতরোক-কাপড় চোপড় রাখার- খারাং, সতকমা- টাকা-পয়সা, অলংকার রাখার ঢাকনায়ুক্ত এক ধরনের ছোট ঝুড়ি, ঢোল ইত্যাদি) বানানো, ঘর তৈয়ার করা ইত্যাদি কাজে দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। কেবল রূপে নয় সাংসারিক কাজে দক্ষতাও উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বড়বোন এসেই রান্নার কাজে মা-বৌদিদের সহায়তায় লেগে যায়। ছোটবোন পা ধোবার জল দিয়ে বসার চাঁটালে (মাচাং এর উপর) পাটী বিছিয়ে অতিথিকে বসতে দিলে, খাবার জল এনে দিলে, বাঁশের হুকায় করে তামাক দিলে। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সামনে একটা কেরোসিনের কুপি এনে জ্বলিয়ে দিলে। যুবক থাইতাকফা এক ফাঁকে তার সঙ্গী রাইদাং (বেতের লাঠি) আর শিমুর (বাঁশের বাঁশী) ওদিকে লাকড়ীর বোঝার উপর তুলে রাখলে আর ঝোলার ভিতর থেকে গুমচাকটি ঘরের চালে রাখা জাঙ্গায় (তরকারী রাখার জন্য ফাঁক ফাঁক করে বেত দিয়ে বোনা এক প্রকার পাত্রে) তরিতরকারীর সাথে লুকিয়ে রাখলে।

সন্ধ্যা পেরুবার সাথে সাথে রাতের খাবার দেয়া হলো। অতিথি বেশ পরিতৃপ্তির সাথে আহার করলে। ( উল্লেখ্য যে তখনকার দিনে পাহাড়ের অধিবাসীদের অনেকে সূর্য ডুবার আগেই রাতের খাবার সেরে নিত। এখনো কোন কোন জায়গায় এ প্রথা চালু আছে। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, রাতে যেমন হিংস্র বন্য জন্তুর ভয় ছিল তেমনি বাজার দূরে হওয়ায় জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা খুব সহজ ছিলনা। সুতরাং রাতে এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য হয়তো এ ব্যবস্থা উদ্ভূত ছিল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অভিভাবকদের সাথে সামান্য পারিবারিক আলাপ আলোচনায়, বিশেষতঃ থাইতাকফার পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে, বংশ পরিচয় সম্পর্কে, খোঁজ খবর নিয়ে গৃহকর্তা বললেন, 'ঠিক আছে, এসেছ যখন দু'একদিন থেকে যেও, বলে সবাই যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলে। (গল্পে যুবতী দু'জনের নাম

এখনও পাইনি। এখানে কাহিনী বর্ণনার সুবিধার্থে তাদের বড় জনের নাম ‘খুমতাই’ এবং ছোট বোনের নাম ‘খুমপৈ’ নাম দিলাম)।

সবাই যখন শুয়ে পড়লে দু’বোন তখন চরকী-চরকা নিয়ে চুলোর পাশে বসে গেল। (চরকীতে তুলা থেকে বীজ ছড়ানো হয় আর চরকায় সূতা কাটা হয়)। খুমপৈ চরকী আর খুমতাই চরকা চালাচ্ছে। থাইতাক্ফা তার সাথে নিয়ে আসা পান সুপারী, প্রসাধনী সামগ্রীগুলো বের করে দিলে। প্রথম পরিচয়ে উভয় পক্ষ তখনো সংকোচ এবং লজ্জার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বড়বোন খুমতাই এর সাথে দু’একটা আধো কথা হচ্ছিল। চরকা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে সে যুবকের দিকে আড় চোখে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিল। থাইতাক্ফাও কম যায় নি। সে একবার বড়বোনের দিকে আর একবার ছোটবোনের দিকে তাকাচ্ছিল এবং মিষ্টি হেসে কি সব সাংকেতিক ভাষায় উত্তর দিচ্ছিল। তাতে উভয় পক্ষের বেশ জমে যায়। (উল্লেখ্য ত্রিপুরা যুবক-যুবতীদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট আলাপ হয় তখন অন্যেরা যাতে বুঝতে না পারে এমন কিছু সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে; তারপর আলাপ যখন আরো গভীরে গোপনে চলে যায় তখন ‘দাংদু’ নামে এক ধরনের বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈয়ারী অথবা লোহা দিয়ে তৈয়ারী বাদ্য যা দুই ঠোঁটের ফাঁকে দিয়ে এক হাতের দুই আঙ্গুলে ধরে অন্য হাতের তর্জনী দিয়ে ঝংকার দেয়া হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন সুর এবং আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়। সে সুর এবং আওয়াজটাই তাদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। এক পর্যায়ে খুমতাই চরকা বন্ধ করে দাংদু বাজাতে শুরু করে। সে সুরে আনন্দ আছে, বেদনা আছে, বিষাদ আছে, আছে প্রাণের আকুতি। সুরের মুচ্ছর্নায় ছোট বোন আর থাইতাক্ফা তন্ময় হয়ে যায়। কিন্তু খুমতাই আর বেশী বাজায় নি। সে দাংদু ছেড়ে দেয়। থাইতাক্ফা বেশ প্রশংসা করে। তারপর সে ছোট বোনকে বাজাতে অনুরোধ করে। ছোট বোন বাজাতে চায়নি। সে জানে না বলে এড়িয়ে যেতে চায়। খুমতাই কিন্তু থাইতাক্ফাকে চোখের ইশারায় বোঝায় যে ছোট বোন ভাল দাংদু বাজাতে পারে। অতিথির পিড়াপিড়িতে খুমপৈ বাজাতে শুরু করে। তার সে সুরে তালে একটা মাদকতা আছে, দরদ আছে। সুর একবার উঠে, একবার নামে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ যেমন বার বার এসে ধু ধু বালুচরে আছড়ে পড়ে তেমনি সে সুর যেন খুমপৈ –এর হৃদয় সাগর হতে উথলে উঠছে আর থাইতাক্ফার হৃদয়ের কূলে কূলে বার বার আঘাত করে মাতিয়ে তুলতে চায়। থাইতাক্ফা সত্যি

সে সুরের স্রোতে ভাসতে থাকে। খুমপৈ -এর প্রতি প্রথম দর্শনেই যেমন তার একটা অব্যক্ত আকর্ষণ ছিল এখন সে সুর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল দূর কোন কল্পলোকে যেখানে সে অনায়াসে বাসর শয্যা রচনা করে চলেছে! এভাবে সে বেশ কিছুক্ষণ বিভোর ছিল। 'দাংদু' যে কখন থেমে গেছে সে খেয়াল তার নেই। বাদক (খুমপৈ) যখন দিদিকে বলে শুতে যাচ্ছে তখন তার সম্বিং ফিরে পায়। তখন সে আনমনে শুধু ডান হাতটা তার (খুমপৈ) দিকে একটা বাড়িয়ে তার গমনের দিকে চেয়ে রইল। খুমপৈ চঞ্চল হরিণীর মত মূহুর্তে বেড়ার আড়ালে চলে গেলে। খুমতাই শুধায়, দাদার কি বড় ঘুম পাচ্ছে? সে উত্তর দেয়- কই, নাতো! তবে? আবার খুমতাই প্রশ্ন করে,

তবে কি ? থাইতাক্ফা পাল্টা প্রশ্ন করে।

'না, এতক্ষণ চুপচাপ ছিলে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি'-। খুমতাই বলে।

ছোট দিদি যে চলে গেল ! সরাসরি উত্তর না দিয়ে থাইতাক্ফা বলে।

খুমতাই - ওহ্ ! রাত হয়েছে তো, সে বেশী রাত জাগে না। তাই শুতে গেছে।

থাইতাক্ -আর- তোমার বুঝি রাত জাগার অভ্যাস ?

খুমতাই - না, তোমার জন্যে বিছানা করা আছে, এসো- এদিকে -।

ভোর রাতে মা দু'বোনকে জাগিয়ে দিলেন। জুমে অনেক কাজ। সকালের আলো ফোটার সাথে সাথে জুমে যেতে হবে। সুতরাং ইতিমধ্যে রান্নার কাজ সারিয়ে ফেলতে হবে। বড় বোন ছোটকে বললে 'তুই আগুন জ্বালা, আমি পাতিলগুলো ধুয়ে ফেলি' বলে রাতের এঁটো হাঁড়ি- পাতিলগুলো নিয়ে ঘাটে গেল। ছোট বোন হাত মুখ ধুয়ে চুলোর ছাই ইত্যাদি পখাইতে করে (পখাই- বাঁশের তৈয়ারীর তিনকোনা বিশিষ্ট একপ্রকার ছোট ঝুড়ি যা' ছাই ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকে 'চিকোক্' -ও বলে) ফেলে দিয়ে চুলোয় আগুন জ্বালায়। তখনো ভোরের আলো ফুটে উঠেনি। তারপর ছাদের উপর থেকে 'জাঙ্গা'টা নামিয়ে তরকারী (শাক-সবজী) কুটতে লাগল। তরকারী কুটতে কুটতে সে গুমচাকটা পেল। বাহ্ ! কি সুন্দর গুমচাকটা ! কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক পাশে রেখে দিলে সে। দিদি যখন ঘাট থেকে ফিরে আসে তখন তাকে শুধালে- 'দিদি, গুমচাকটা কি তুমি রেখেছিলে ? দিদি প্রশ্ন করে - কোথায় ? 'তরকারীর সাথে' বলে খুমপৈ। দিদি বলে, না ---!

তখন তারা ধরে নেয় মা হয়ত রেখে দিয়েছেন। দু'জনে তখন ভাগ করে খেয়ে ফেললে।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তাদের রান্না শেষ। অতিথি ওঠলে মুখ হাত ধোবার জল দেয়া হলো। তারপর নারিকেল কুরে দেওয়া জুমের নূতন বিনি ভাত দিয়ে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করা হলো। থাইতাকফাদেরও বিনি ধান আছে। কিন্তু মনে হলো তার এ বিনি ভাত যেন বেশী স্বাদের, বেশী সুগন্ধীয়ুক্ত। এমন রান্না মা-বৌদিরা রাঁধতে পারেনি।

প্রাতঃরাশের পর থাইতাকফা কি যেন খুঁজতে থাকে। তাকে হঠাৎ বিচলিত দেখাচ্ছে। তা দেখে খুমতাই জিজ্ঞেস করে- 'দাদার বুঝি ভাল ঘুম হয়নি ? রান্না খুব বাজে হয়েছে- তাই না ? আমাদের আপ্যায়নে ত্রুটি হয়েছে?

থাইতাকফা বলে, সব কিছু ঠিক আছে। শুধু একটু গভগোল হয়ে গেল ! আমার জিনিসগুলো খুঁজে পাচ্ছি না! এই বলে একবার এধার একবার ওধারে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

শুনে দু'বোনের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারা ভাবে 'বুঝি সাথে সোনা-রূপার জিনিস ছিল, বা টাকা-পয়সা হবে। রাতে হারিয়ে গিয়েছে। দু'বোন একবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারা পরস্পরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু কেউ কিছু আঁচ করতে পারেনি। সত্যি কিছু হারিয়ে গেলে তো তাদের লজ্জার অবশেষ থাকবে না। বড় বোন আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে,- 'কি জিনিস দাদা ? কোথায় রেখেছিলে?

থাইতাকফা কিছুক্ষণ আমতা আমতা করার পর বলেই ফেলে 'আমার রাইদাং আর শিমুর গত রাতে ঐ লাকড়ীর উপর তুলে রেখেছিলাম আর একটা 'গুমচাক বাথাই' রেখেছিলাম ঐ ছাদের উপর তরকারীর 'জাঙ্গায়। শুনে দু'বোনের চোখ ছানাবড়া। তারা পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে একেবারেই চুপসে গেল। দু'জনে ঘরের ভিতর পালিয়ে যায়। খুমপৈ দিদিকে বলে চুপিসারে,- 'আমিতো রাতে খেয়াল করতে পারিনি, লাকড়ী ভেবে 'রাইদাং, শিমুর' সব চূলোয় ঠেলে দিয়েছি; আর গুমচাকতা তো দু'জনেই খেলাম ! এখন উপায় --- ? দু'জনে চুপি চুপি যুক্তি

করে,- দোষ স্বীকার করবে: আর জুম থেকে একটার পরিবর্তে কয়েকটা ‘গুমচাক’ এনে দেবে, বাবার রাইদাং লাঠি আর বড় ভাইয়ের শিমুরটা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। এভাবে প্রস্তাব নিয়ে লজ্জা অবনত হয়ে দু’বোন আবার যুবকের সামনে এসে দাঁড়ালে। বললে- দাদা, আমরা না জেনে বড় অপরাধ করে ফেলেছি; রাতে ঠাহর করতে পারিনি। তাই লাকড়ী ভেবে রাইদাং আর শিমুর জ্বুলিয়ে ফেলেছি। আর গুমচাক---, মা বোধ হয় আমাদের জন্যে এনে রেখেছেন ভেবে আমরাই খেয়ে ফেলেছি। কারণ মা প্রায়ই এভাবে এনে রাখেন। তোমাকে আজই আমরা বেশ কয়েকটা গুমচাক এনে দিচ্ছি। বাবার রাইদাংটা বহু দিনের, রূপোয় বাঁধানো, আর বড়দা দার তো বেশ কয়েকটি শিমুর আছে, ভাবনা কি ? বোলা, আমাদের ক্ষমা করেছ?

ততক্ষণে বাড়ীর সবার জানাজানি হয়ে যায় যে একটা গন্ডগোল হয়েছে। মা-বাবারা এসে বিস্তারিত জেনে মেয়ে দু’টোকে সঙ্গেহে একটু ধমক দিয়ে থাইতাক্ফাকে বললেন,- তুমি, বাবা- দু’একদিন থেকে যেয়ো। আর মেয়েদের দোষ নিও না। তারা না জেনেই অপরাধ করেছে ---। এভাবে বাবা বিষয়টা হাক্কা করে তাদের সুন্দর সকালটাকে বিব্রতকর অবস্থার হাত থেকে বাঁচালেন।

কিন্তু থাইতাক্ফার জন্যে বিষয়টা খুবই গুরুতর ছিল। সে কি যেন বলতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছে না। তার হাব-ভাব দেখে বাবা সহাস্যে জিজ্ঞেস করেন,- কি বাবা, কিছু বলবে ? থাইতাক্ফা ব্যাপারটা আর, চেপে না রেখে ওদের মা-বাবাকে সেও ‘মা, বাবা’ বলে সম্বোধন করে বলতে শুরু করে,- মা, বাবা ! জুমে ধান কাটতে কাটতে আমি এ গুমচাকটা পাই। তা খুবই সুন্দর ছিল। বৌদিদের সাথে কৌতুকচ্ছলে বলে ফেলি যে অবিকল এ গুমচাক -এর মত মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো। বৌদিরাও ঠাট্টাচ্ছিলে বললেন,- অবিকল এ গুমচাকের মত মেয়ে খুঁজে আনতে পারলে তবেই ত তুমি পুরুষ মানুষ --- ইত্যাদি। এভাবে শেষাবধি তাঁদের সাথে আমার বাজি ধরাধরি হয়ে যায়। তাই তো মেয়ে খুঁজতে আমি বেশ কিছুদিন হয় ঘর থেকে নেমেছি। যদি না পাই তবে আর ঘরে ফেরা হবে না। সাথে তাই এ গুমচাককে রেখেছি। ঘুরতে ঘুরতে যখন আপনার দুই মেয়েকে ঘাটে দেখি আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাই ! আমার চোখ দু’টোকে বিশ্বাস করতে পারিনি যে অবিকল এ গুমচাকের মত মেয়ে ও হয় ! বোলা থেকে অলক্ষ্যে গুমচাকটা বের করে আপনার

মেয়েদের সাথে তুলনা করতাম। ছোটটা অবিকল গুমচাকের মতই এবং গায়ের রংও খুবই ফর্সা। আমি তাকে পছন্দ করেছি। তাকে আমি ঘরে নিতে চাই।

শুনে তখন সবাই খুশী হলো এবং একটা সুন্দর তিথিলগ্ন দেখে থাইতাকফার সাথে খুমপৈ -এর বিয়ে দেয়া হলো। কিছুদিন থাকার পর এবার থাইতাকফা বৌ নিয়ে বাড়ী যাবে। মা মেয়েকে নানা কারুকার্য দিয়ে বোনা নূতন 'রিনাই-রিসা' (পিনন-খানি), পায়ে নানা অলংকার বেংকি মল, গলায় চন্দ্রাহার আর রংবেরং -এর পুঁতির মালা, বাহুতে খালচি (আর্মলেট), দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মেয়ে বিদায় নিলে। মা-বাবা ছল ছল চোখে অতি আদরের ছোট মেয়ের যাবার পথে তাকিয়ে রইলেন। (অশ্রু গোপন করলেন।

নববধূ ! গুমচাকের মত বৌ নিয়ে প্রায় সন্ধ্যাকালে থাইতাকফা তাদের ঘাটে গিয়ে পৌঁছলে। নববধূকে সে সরাসরি বাড়ী নিয়ে যাবে নাকি বাড়ীতে খবর দিয়ে এখান থেকে বরণ করে নিয়ে যাবে সহসা স্থির করতে পারে নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর নববধূকে ঘাটের একপাশে একটু আড়ালে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালালে। ইচ্ছা যে বৌদিদের বাজিতে হারিয়ে সে যে বিজয়ী তা দেখানো। কাজেই ব্যাপারটা যেমন তেমন ব্যাপার নয়। তারা অতদূর পথ হেঁটে এসেছে বৌদিরা কেন ঘরে বসে বসে এ ধন লাভ করবে। সুতরাং তারা এসে বধূ বরণ করে নিয়ে যাবে বৈ কি !

এদিকে সিংকলকমা এক রাক্ষসী নামে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করছিল এবং সব কথাবার্তা শুনছিল। এবার নববধূকে একা পেয়ে চুপিসারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নববধূর পাশে দাঁড়ালো। নববধূ শিউরে উঠে ভয়ে। কিন্তু সিংকলকমার চেহারা একজন সাধারণ নারীর রূপ ছিল। তাই তার মিষ্টি কথার ভয় কেটে যায়। সে বলতে থাকে, 'আহা ! বৌদিদি যে ! তা দাদা কেন তোমাকে একা এখানে রেখে গেলে ! তার একটুও বুঝি কান্ড জ্ঞান নেই ---' ইত্যাদি। খুমপৈ উত্তর দেয় সে বাড়ীতে খবর দিতে গেছে। এক্ষুণি এসে পড়বে বলে --- ।

ও ! তাই ! বলে সিংকলকমা নববধূর রূপের প্রশংসা করতে শুরু করে। তারপর তার পিনন, খাদি, পরনের অলংকারপাদিরও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে

লাগল। এদিকে ঝাঁ ঝাঁ পোকা আর কুহকের অবিরাম ডাক সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারকে আরো রহস্যময় করে তুললো ! নববধূর অন্তর কেন জানি এক অজানা আশঙ্কায় দোলা দিয়ে ওঠে?

আহা ! আমার যদি এ রকম কাপড়, অলংকার ইত্যাদি থাকতো! সিংকলকমা বলতে থাকে। আমাকে কেমন মানাবে বৌদি ? তোমার হাতের বালাটা কি একটু পরে দেখতে পারি? নববধূ ইতস্তত করতে করতে খুলে দিলে। তারপর কানেরটা, পিননটা, খাদিটা সবচেয়ে- খানিকটা জোর করে বলা যায় নিয়ে ফেলল। এবার জিজ্ঞেস করে,- দেখো তো বৌদি, আমাকে কেমন মানিয়েছে? খুমপৈ বলে বেশ তো ---! মুখে বলে- ‘বেশ তো’। কিন্তু মনে মনে বলছে-‘বানরের গলায় মুক্তার হার’। বসন-ভূষনের সাথে সিংকলকমাকে মোটেও মানাচ্ছে না। সিংকলকমা এবার খিল খিল করে হাসতে হাসতে এধার- ওধার নিজেকে দেখতে থাকে। তার যেন আনন্দ ধরে না। এক পর্যায়ে সে নববধূকে সুরসুরি দিতে শুরু করে। নববধূ ফিক্ করে হাসে আর অনুরোধ করে দোহাই দিদি, সুরসুরি আমার একদম সহ্য হয় না। সুরসুরি দিও না। কিন্তু কে কার কথা শুনে। নববধূ সুরসুরিতে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যায়, পেটে খিল ধরে। একসময় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর সিংকলকমা নিমিষে সে মৃত দেহ খেয়ে ফেলে। কিন্তু খাবার সময় খুমপৈ -এর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ পার্শ্ববর্তী কুয়ায় পড়ে যাওয়াতে সেটা সেখানে রয়ে যায়। মূহূর্তের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার করে রাক্ষসী নিজে নববধূ সেজে ঘাটের একপাশে জড়সড় হয়ে নিরীহের মত খাদিটা মাথায় ঘোমটার মত দিয়ে স্বামীর অর্থাৎ থাইতাকফার প্রতীক্ষার (ভান করে) দু’হাঁটুতে মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। বাড়ীতে বৌদিরা, মা-বাবারা থাইতাকফার কথা কেউই প্রায় বিশ্বাস করতে পারে নি। কারণ একেবারে গুমচাকের মত মেয়ে পাওয়া ---? তারা সবাই ভেবেছিল থাইতাকফা এমনিই কৌতুক করছে। শেষ পর্যন্ত সে সবাইকে বুঝিয়ে নববধূ বরণের আয়োজন করাল। মা-বাবা ভৎসনা করলেন তুই বোকা, মেয়ে কেন ঘাটে রেখে এসেছিস? যা, শিগগীর গিয়ে ঘরে আন। তখন সবাই আগুন জ্বালিয়ে, কুপি হাতে ঘাটের দিকে চলল। গুমচাকের মত মেয়ে দেখতে সবাই আগ্রহী ও খুশী ছিল। ঘাটে এসে সবাই দেখতে পায় নববধূ অন্ধকারে জড়সড় হয়ে একাকী বসে আছে। বৌদিরা থাইতাকফার প্রতি একটু রুষ্ট হয়ে বলে- তোমার

কোন কান্ডজ্ঞান নেই ! আহা ! অতটুকু মেয়েকে একাকী এভাবে অন্ধকারে রেখে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না । সরাসরি বাড়ী নিয়ে যেতে পারতে ---' ইত্যাদি । দুই বৌদি নববধূকে ধরে আস্তে করে তুললে আর মুখের ঘোমটা সরিয়ে মুখটা আলোর সামনে মেলে ধরে । দেখেই তাদের উভয়ের দৃষ্টি প্রচণ্ডভাবে আহত হয় ! মুখ-চোখ বিস্ময়ে হতবাক । মনে মনে যে রূপের কল্পনা করে তারা নববধূ বরণ করার জন্যে হাস্যে লাস্যে ছুটে এসেছে বধূর রূপ দেখে হাস্য লাস্যময়ী বৌদিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল । মুখে কথা সরল না । সর্পাহতের মত তারা দু'পা পিছনে সরে দাঁড়ালে ! থাইতাক্ফার দশা আরো করুণ ! সে রেখে গেল একরূপ, এসে পেল অন্যরূপ ! সে একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বোবা হয়ে গেল । আঁধারের নিস্তব্ধতা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল । আর তখনি বধূ হিঁ হিঁ করে হেসে উঠলে, অন্ধকারকে আরো বিভীষিকাময় করে দিল ! মুখ থেকে কাঁচা মাংস ভক্ষণের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; দাঁতগুলো বেশ লম্বা লম্বা,- ময়লা । গায়ের কাপড় চোপড় সব ভেজা, শরীরের সাথে লেপ্টে আছে । বলে,- পিপঁড়ের কামড়ে বসে থাকতে পারিনি । একটু হাঁটতে গিয়ে অন্ধকারে পা ফস্কে কুয়োয় পড়ে গেলাম । তোমরা এত দেরী করলে যে --- ? আমার বড্ড ভয় করছিল --- ইত্যাদি ।

বৌদিদের তখন সম্বিৎ ফিরে আসে এবং বুঝে নেয় যে এ ছলনাময়ী নারীর পাল্লায় পড়ে থাইতাক্ফা বিয়ে করে এনেছে । এখন তো করার কিছু নেই । চল, বধূ নিয়ে চল এই বলে সবাই বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় । থাইতাক্ফা বুঝাতে চেষ্টা করে - 'বৌদি, বড় বৌদি, ছোট বৌদি, আমি একে আনিনি । আমার স্ত্রী এ নয় --- ' ইত্যাদি । বড় বৌদি ধমকের সুরে বলে 'খ্যৎ, এখন আর লজ্জা করার কিছুই নেই । চল বৌ নিয়ে বাড়ী চল বলে সবাই বাড়ীর দিকে চললে । অগত্যা তখন আর কি করা, সে বৌ নিয়ে বাড়ী চলল । বিষন্ন বদনে সবাই নববধূ বরণ করে নিলে । থাইতাক্ফা সবাইকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে । কিন্তু বোঝাতে পারিনি । বরং সবাই থাইতাক্ফাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে । পরদিন পাড়ায় প্রচার হয়ে যায় থাইতাক্ফা বৌ এনেছে । পাড়ায় মেয়ে-ছেলেরা নূতন বৌ দেখার জন্য আসে । কিন্তু দেখে তারা সবাই হতাশ হয়ে যায় । কেউ বলে বৌ তো দাদীর সমান, থাইতাক্ফা দাদীকে বিয়ে করে এনেছে । কেউ বলে নূতন বৌদির কয় সন্তান আছে রে? কেউ বলে বৌদি দেখছি একেবারেই সন্যাসিনী । কিছু খায় না বুঝি? গায়ে যে হাড়ি আর



চামড়া ছাড়া যে কিছুই নেই --- ইত্যাদি ইত্যাদি, থাইতাক্কার নীরবে হজম করা ছাড়া গতান্তর ছিল না।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। ঘটনাটা প্রায় সহজভাবে মেনে নিয়েছে সবাই। সিংকলকমা ঘাটে যায়। জল তুলে, ভাত রান্না করে। কিন্তু তার রান্না করা ভাত-তরকারী খাওয়াই যায় না। কোন সময় ভাত সিদ্ধ হয় না, কোন সময় পোড়া ভাত, কোন সময় তরকারীতে বেশী লবণ হলো, কোন সময় যেন মরিচ রান্না হয়েছে, মরিচে সামান্য তরকারী মিশানো হয়েছে। কোন সময় ভাত হয়ে গেল পায়ের মত। কুয়ো থেকে সে একবারও স্বচ্ছ পরিষ্কার জল আনতে পারে নি। সে যখন ঘাটে যায় তখন দেখে কুয়োর জল সম্পূর্ণ ঘোলা। কুয়ো পরিষ্কার করে অপেক্ষা করেছিল পরিষ্কার জল আনার জন্যে। কিন্তু নূতন জল ঘোলাটেই থেকে যায়। অন্যেরা গেলে স্বচ্ছ পরিষ্কার জল পায়। বাড়ীর সবাই মনে করে মেয়েটা ইচ্ছে করেই কুয়োর জল ঘুলিয়ে আনে। এ নিয়ে তার বেশ কথাও শুনতে হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার অন্য। গুমচাক বধূকে খেয়ে ফেলার সময় খুমপৈয়ের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ ফস্কে কুয়োয় পড়েছিল। আর তা তৎক্ষণাৎ আ-সরাই (এক জাতীয় টাকী মাছ) হয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। সিংকলকমা যখন জল তুলতে যায় তখন তার অলক্ষ্যে মাছটা কুয়োর জল ঘোলাটে করে দিয়ে যায়। তাই সে কোন দিন পরিষ্কার জল নিয়ে যেতে পারে নি। এভাবে আরো বেশ কিছুদিন কেটে যায়। সিংকলকমা ভাবে- সবাই পরিষ্কার জল আনে আর আমি গেলে কেন জল ঘোলা থাকে --- ? সে খুব সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সে ঘাটে নামার আগে লুকিয়ে কুয়োর দিকে নজর রাখে- কেউ দুষ্টামি করে কুয়োর জল নষ্ট করে কিনা। অনেক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখতে পায় কেউ আসে না তখন ঘাটে নামতে থাকে। এমন সময় দেখতে পায় একটা মাছ কুয়োর ভিতর লাফালাফি করে কুয়োর জল ঘুলিয়ে দিয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছে ! তখন সে গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাছটা ধরে আনলে। বলে 'তুই' -ই তো এতদিন আমাকে ভোগালি; এবার তোকে নিয়ে আমি মজা করে খাবো' বলে বাড়ী নিয়ে গেলে। উঠোনে বসে মাছটি কুটে ফেলে। মাছটি কুটে গিয়ে সে হাত কেটে ফেলে। যা হোক, মাছের কিছু সে বাদ দেয় নি। কেবল এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল উঠোনে। মাছটি সে রান্না করে খেয়ে ফেলে।

দু'দিন পর দেখে উঠানে একটা লাউ গাছ গজাল। কিন্তু সিংকলকমা বুঝতে পারেনি যে লাউ ঐ এক ফোঁটা রক্ত থেকে গজিয়েছে। সে চাউল ধোয়ার জল ঢেলে, তরকারী ধোয়ার জল ঢেলে ঢেলে ঐ লাউ গাছ রীতিমত বাড়িয়ে তোলে। লাউ গাছ তরতর করে বেড়ে উঠে ছাদে। এক সময় ফুল এল, লাউ হল। একটা লাউ ঠিক দরজার উপর ঝুলে পড়েছে। সিংকলকমা ঘরের ভিতর বাহির হতে লাউটা তার মাথায় আঘাত করে। সে দেখছে যে লাউটা বড় হবার সাথে সাথে ভারে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। তাই তার মাথায় লাগে। সে সময়ে তা আবার ছাদের উপর তুলে দেয়। স্থির করে যে এটা সে বীজের জন্যে রেখে দেবে এবং অন্যগুলো খাবে। কিন্তু না, লাউটা বরাবর সিংকলকমা ঘরের ভিতর-বাহির হবার সময় এসে মাথায় আঘাত করে! শেষে বিরক্ত হয়ে সে লাউটা পেড়ে নেয় এবং রান্না করার জন্যে খোসা ছাড়াতে থাকে। কিন্তু লাউয়ের খোসা ছাড়াতে গিয়ে সে নিজের বাম হাতের চামড়া সব ছিঁড়ে ফেলে! এভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় সে লাউ রান্না করতে থাকে। কিন্তু পাত্রের জল যখন ফুটতে আরম্ভ হলো সিংকলকমা কেবল তার নাম ধরে গালি-গালাজ শুনতে পায়, অর্থাৎ লাউয়ের জল ফোটার শব্দ কেবল তাকে গালি গালাজ করছে। সে তখন পাত্রটা ঢেকে দেয়। কিন্তু ঢাকনা বারবার খুলে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত সে আর লাউ রাঁধতে পারে না। রাগে সব উঠানের ওপাশে ঢেলে দিয়ে আসলে। কুয়া থেকে জল তোলা থেকে এ পর্যন্ত পদে পদে তার যে বিপর্যয়,— কেন? তার কারণ সে খুঁজে পায়নি। সেও বাড়ীর কারোর সাথে ভাল ব্যবহার করেনি। ফলে সবাই তার উপর তিক্তবিরক্ত। এবার বাবা থাইতাকফাকে পৃথক করে দিলেন। থাইতাকফা মনের দুঃখে রান্নাশীকে নিয়ে পাড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ছোট ঘর বাঁধে, কষ্টে দিন কাটায়। তাদের কোন সন্তান হয়নি।

কিছুদিন পর দেখা গেল সিংকলমা যেখানে লাউ ঢেলে দিয়েছিল সেখানে একটা নারিকেলের চারা গজেছে। নারিকেল চারা তরতর করে বেড়ে উঠতে লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যেই গাছে ফল আসল। নারিকেল পাকলে একদিন থাইতাকফা একটা নিয়ে গিয়ে খোসা ছাড়িয়ে সুন্দর ভাবে তুলোর ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে রাখলে। স্ত্রী জানতে পারেনি। জানলে সে নির্ঘাত খেয়ে ফেলবে সে আশঙ্কায় স্ত্রীকে জানতে দেয়নি।

প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই জুমে চলে যায় স্বামী-স্ত্রী। দুপুরে এসে নিজে পাক করে খায় থাইতাক্ফা। স্ত্রীর পাক সে আর খেতে পারে না। কাজেই রান্নার দায়িত্ব সে নিজের হাতে নিয়েছে। দুপুরে সে একটু আগে ভাগে এসে রান্নার কাজ সেরে ফেলে আর স্ত্রী পরে এসে খেয়ে যেত।

একদিন জুম থেকে এসেই দেখতে পায় সব ঠিকঠাক রান্না করা ! তাকে আর কিছুই করতে হয়নি। খেতে গিয়ে দেখে আজকের রান্নার আলাদা স্বাদ! তবে সিংকলকমার রুচিসম্মত হয়নি। যা হোক, থাইতাক্ফা মনে মনে আন্দাজ করে নেয় ‘হয়ত ও বাড়ীর মেয়েটা এক ফাঁকে রন্ধে দিয়ে গেছে। এভাবে পরপর কয়েকদিন সে জুম থেকে এসে রান্না করা ভাত খেয়েছে। ও বাড়ীর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না বলে জানায়। থাইতাক্ফা বিষয়টা সিংকলকমাকে বলেনি। এবার সে স্থির করে যেকোন ভাবেই হোক, - এ রহস্যের উদ্ঘাটন করতে হবে।

পরদিন স্ত্রীকে বললে- আমার অসুখ করছে। আজ জুমে যেতে পারবো না। তুমি যেয়ো। জুমে না গেলে আবার বন্যপশুপাখীরা সব ফসল নষ্ট করে দেবে। এই বলে থাইতাক্ফা কাপড় মুড়ি দিয়ে গুয়ে পড়লে। সিংকলকমা একা জুমে চলে গেল। থাইতাক্ফা ঘুমের ভান করে পড়ে রইলে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকার পর ঘরের ভিতর যেখানে তুলোর বুড়ি রাখা ছিল সেখানে খুটখাট শব্দ হতে থাকে। সে কাপড় একটু ফাঁক করে রাখলে যেন দেখে নিতে পারে। দেখে -এ তুলোর ভিতর থেকে উঠে আসছে তার হারানো স্ত্রী ‘গুমচাক জোকমা’। রিনাই (পিনন), রিসা (খাদি) পরা পায়ে রূপোর মল! অপূর্ব সুন্দরী এ মেয়ে বেরিয়ে এসে যেই তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে থাইতাক্ফা চট করে উঠে তাকে ধরতে চাইলে। স্ত্রী গুমচাক তখন ছি ! ছি ! করে পিছনে দু’পা সরে দাঁড়ালে। বলে- তুমি রাক্ষসীকে নিয়ে ঘর করছ। তাই তোমার ঐ অপবিত্র শরীরে আমাকে স্পর্শ করবে না।’ থাইতাক্ফা বলে- তোমার জন্যে আমার জীবনটা এভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল আর তুমি বলছ অন্য কথা। তোমাকে যখন পেলাম আর হারাতে চাইনা ! তখন গুমচাক জোকমা স্বামীকে বুঝিয়ে বলে- ‘শোন, আমি তো তোমারই, এতদিন নানাভাবে তোমার আশে-পাশে ঘুরছি। তোমাকে পাবার জন্যে আমার মন

কেমন ব্যাকুল হয়ে আছে তা তোমাকে বুঝাই কি করে ! একথা বলতে গিয়ে গুমচাক জোকমার চোখ দু'টো ছল ছল করে ওঠে । সে বাম হাত দিয়ে চোখ মুহতে লাগল আর বেশ কিছুক্ষণ আবেগে কথা বলতে পারেনি । তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল । এবার নিজেকে সামলিয়ে সে আবার বলতে শুরু করে— “ঐ রাক্ষসীর দ্বারাই আজ এত দুর্দশা”, —এই বলে সে স্বামীকে আদ্যপান্ত সব ঘটনা খুলে বলে । সে ঘটনার বর্ণনা শুনতে শুনতে থাইতাক্ফার চোখের জল আর কোন বাধা মানে নি । ঝর ঝর করে গভ বেয়ে অশ্রু পড়তে থাকে । স্ত্রীর কাহিনী শেষ হবার পরও তার তনুয়ভাব কাটেনি । স্ত্রী যখন বললে— ‘একি, তুমি কাঁদছ? তখনি সে একটু প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে । স্ত্রী বলে— ‘শোন, রাক্ষসী সতীনকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয় । তার রক্ত দিয়ে যদি তুমি আমার পা ধুয়ে দিতে পার তবে আমি এ বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাবো । আর তুমি আমাকে পেতে পারবে ।’ এই বলে সে আবার তুলোর ঝড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকলে এবং নারিকেলে পরিণত হলো ।

সবকিছু শোনার পর থাইতাক্ফার মাথায় রক্ত চড়ে যায় । মনে মনে ফন্দি আঁটে কিভাবে সিংকলকমাকে হত্যা করা যায় । স্থির করে ঠান্ডা মাথায় এগুতে হবে । নইলে উল্টো তার জীবন নিয়ে টানাটানি হবে ।

কিছুদিন যেভাবে চলছিল সেভাবে কাটল । থাইতাক্ফা সিংকলকমাকে কোন কিছু বুঝতে দেয়নি । জুমের ধান ইতিমধ্যে কাটা ও মাড়াই হয়ে যায় । একদিন থাইতাক্ফা বলে— ‘আগামীকাল একটু বিশ্রাম নেবো । জুমে যাবো না । সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে ছড়ায় যাবো মাছ ধরতে । এই বলে সে শুয়ে পড়লো । স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে সিংকলকমা নিত্যদিনকার মত অন্যরূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে । আবার ভোরে স্বামী ঘুম থেকে জাগার আগে সে ফিরে এসে শুয়ে থাকে ।

পরদিন সকাল সকাল দু'টো খেয়ে উভয়ে নেমে পড়ে মাছ ধরতে । থাইতাক্ফা তার ব্যবহারের ‘দা’ টা শিলায় ঘষে ধারাল করে নেয় । একটা লুসি (লুই), একটা ‘কাইসিলিং’ (জুমে ধানের বীজ বপন করার সময় কোমরে বেঁধে বীজ বহন করার এক ধরনের ছোট ঝুড়ি) আর একটা ‘চেমাই’ (কাইসিলিং এর চেয়ে একটু বড়, পাঁচ কেজি থেকে দশ কেজি পর্যন্ত ধান রাখা যায়— এমন আকারের ঝুড়ি) সাথে নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ে । লুসি দিয়ে একবার— এ, একবার— সে

এভাবে মাছ ধরতে ধরতে এবার সিংকলকমা এর ভাগে লুসি ধরার ভার পড়ল। থাইকফা একটা বড় বাঁশের চোঙ্গা কেটে নিল। সিংকলকমা শুধায়— কি হবে গো ? সে বলে— চিংড়ি দিয়ে তরকারী ‘গুদিয়ে’ খাবো। (পাহাড়ীরা বাঁশের চোঙ্গায় তরকারী রান্না করে একটা লাঠি দিয়ে সেটাকে পিষিয়ে চোঙ্গার ভিতর পেঁষ্ট করে ফেলে। এটাকে ‘গুদিয়ে খাওয়’ বলে। কাঁচা চোঙ্গার তরকারীর আলাদা স্বাদ আছে)। এভাবে স্ত্রী লুসিতে মাছ ধরছে আর সে আস্তে আস্তে মাছ তাড়িয়ে আনছে, শিলাগুলো উল্টিয়ে তার নীচ থেকে চিংড়ি, কাঁকড়াগুলো বের করে দিচ্ছে। এদিকে তার অলক্ষ্যে স্ত্রী দু’একটা কাঁচা মাছ, চিংড়ি গালে পুরে নিচ্ছে। তবে থাইতাকফার দৃষ্টি একেবারে এড়িয়ে যাচ্ছে— তা নয়। সে দেখেও না দেখার ভান করছে। তার ইচ্ছা যে রাক্ষসী যেন কোন রকম সন্দেহ না করে। মাছ, কাঁকড়া ধরার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ বুঝে থাইতাকফা সিংকলকমাকে দু’একটা ‘দা’য়ের কোপ মারার চেষ্টা করে। স্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে,— ‘এ তুমি কি করছ? আমার গায়ে লাগবে যে --- ! সে উত্তর দেয় — ওরে বাবা ! তোমার পাশ দিয়ে যে কাল সাপটা সাঁ করে চলে গেল; আমি না দেখলে তোমাকে নির্যাত, ছোবল মেরে চলে যেত। ‘তাই নাকি! স্ত্রী সত্যি ভয় পায়। ‘আমি তো খেয়াল করিনি। যাক ফাঁড়া কাটা গেল, বাবা ! বলে সিংকলকমা আবার লুসিতে মাছ ধরতে শুরু করে। তখনকার দিনে পাহাড়ী ছড়ায় প্রচুর মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি পাওয়া যেত। আবার পদে পদে যেমন বন্য জন্তুর ভয় তেমনি সাপ, গিরগিটি, বিচ্ছুটি ইত্যাদির ভয়ও ছিল। থাইতাকফা একবার সাপ, একবার বিচ্ছুটি, একবার গিরগিটি ইত্যাদির অজুহাতে সিংকলকমাকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু এবার সে সত্যি কোপ মারে এবং সিংকলকমার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। চারদিক ছিটকিয়ে রক্ত পড়তে থাকে আর মস্তকবিহীন দেহটা কিছুক্ষণ ধড়ফড় করতে করতে করতে নিখর হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি চোঙ্গাভর্তি রক্ত সংগ্রহ করে নেয়। এদিকে সিংকলকমার রক্ত যেখানে যেখানে পড়েছে সব রক্ত চোষা জোঁকে পরিণত হল।

সন্ধ্যার দিকে রক্ত নিয়ে থাইতাকফা ঘরে ফেরে। চোঙ্গাটা ঘরের এক কোণে রেখে কলসী নিয়ে সে ঘাটে যায়। ভাল করে স্নান সেরে এক কলসী পরিষ্কার জল, কলাপাতা, ফুল সংগ্রহ করে ফিরে আসে। তার মন তখন আনন্দ-বেদনার দোলায় আন্দোলিত হচ্ছে। আনন্দ ! — তার গুমচাক বৌকে সে ফিরে পাচ্ছে। বেদনা! রাক্ষসী হলেও সিংকলকমার সাথে সে কিছুদিন ঘর করেছে যদিও সে

দময়ন্তীকে মধুর ছিল না, বরং তিক্ততায় ছিল ভরা। সে ভাল কাপড় চোপড় পরে, কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কাছে তো আর নেই নেই। তাই তাকে একাই বধূবরণ করতে হবে যে ! প্রকৃত বধূবরণ! সন্ধ্যা গমন অতিক্রান্ত প্রায়, যে সময়টাতে প্রথম এসে নববধূ হিসাবে স্বামীর ঘরে পান দেবার কথা ঠিক সে সময় সে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঐ বুড়ির ভিতর থেকে দীপের ধীরে উঠে আসে। তার সেই হরিণ চপল চোখ দু'টো লজ্জাবনত; পায়ের মল পাঞ্জছে খুব ধীর লয়ে, পা তার সামনের দিকে চলছে কি চলছে না। হাতে চুড়ির গিনিঝিনি শব্দ খুব ক্ষীণ বাজছে, যেন কানে কানে বলছে 'আমি এসেছি গো' ! থাইতাক্ষা আর বসে থাকতে পারেনি। ঐ ফুল গুলো নিয়ে সে গুমচাক বৌ এর দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর আগে থেকে পেতে রাখা আসনের দিকে ইশারা করে এসতে বললে। রামচন্দ্রের মহামায়া আবাহন ! বধু এসে আসনে বসলে। থাইতাক্ষা চোঙ্গার সমস্ত রক্ত বধুর চরণে ঢেলে দিলে। নববধুর চরণ যেন 'আলতা পাণ্ডা' হয়ে গেল। আর তখনি সে পুনরায় মনুষ্য জন্ম ফিরে পায়। নববধূকে কলসীর নির্মল জলে স্নান করিয়ে থাইতাক্ষা আবার নূতনভাবে বরণ করে নিলে। তারা পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ ধরে কাঁদলে! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে তৈবুংমার (মা- গঙ্গি) কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক জোড়া সাদা ছাগল বলি দেবে।

পরদিন সকালে তারা উভয়ে বাবার বাড়ী গিয়ে হাজির হলে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারা উভয়ে মিটিমিটি হাসছে আর সবার পায়ের ধূলো নিচ্ছে। সবাই কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক। তারা ভাবছে— 'স্বপ্ন নাতো --- ! থাইতাক্ষা সবাইকে সব ঘটনার আদ্যপান্ত বলতে শুরু করে --- ! তখন সবার মধ্যে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগে বার বার, আর নববধুর প্রতি করুণায় ভরে ওঠে মন।

তারপর তৈবুংমার কাছে পূজা দিয়ে এবার শুভক্ষণে বধূকে বরণ করে নেয়। আবার তাদের সংসারে (পরিবারে) আনন্দ আর সমৃদ্ধির সুবাতাস লেগে যায়।

হামখা ! রাকখা !! থাকখা !!!

(হামখা— ভাল হয়েছে। রাকখা— শক্ত হয়েছে। থাকখা— সমাপ্ত হয়েছে)

## তঞ্চঙ্গা গান

### নআ চানান

কথা- ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

ও --- নআ চানান

খুশী লায়ের ম মনান্  
ত দেশচান্ ঐ দেবাত্ তলে  
হীরা মানিক কদক্ জ্বলে  
চালে মত্তুন চোখ জুড়ান্ ।

দূরত্ কেনে থাই ন- পাং  
মনে মনে উড়ি চাং  
কেনে থাইওে ছিত্ দূরত্ ?  
তারা গনে এক সুরত্  
আয়না লামি আয় পরান্ ।

সু অ রাজ্য, দেব রাজ্য  
ব্যাকথান চিধি পারাপাং  
আর আঁহে স্বর্গ ছড়া  
মন্দাকিনী গাং ঐ  
আয়না লামি আয় পরান ।

### [অনাবাদ ৪- নতুন চাঁদ]

ওহে নতুন চাঁদ

দেখে আমার ভালো লাগে  
দেশটি তোমার আকাশ তলে  
হীরা মানিক কত জ্বলে  
দেখে আমার চোখ জুড়ায় ।

দূরে আছো তাই যেতে নাই পারি  
মনে মনে উড়ে দেখি  
ভাবি কতদূরে আছো তুমি  
তারকাদের সাথে ।  
থেকোনা তুমি দূরে ।

এসো নেমে আমার পাশে  
সুখের রাজ্যে স্বর্গ রাজ্য  
মনে হয় সবি আছে সেথায়  
আরো আছে স্বর্গীয় নদী  
মন্দাকিনী নাম  
এসো তুমি আমার পাশে ।

---

[ ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সাবেক ডিস্ট্রিক্ট কানুনগো, রাঙ্গামাটি । (এই গানটি তৎকন্যা  
এ্যানী তঞ্চঙ্গ্যার নিকট থেকে সংগৃহীত)

# চাকমা বারমাসীর উদ্ভব ও বিকাশের ধারায় মা-বাব' বারমাস

## আর্থ মিত্র চাকমা

১

বাংলা বারমাসীগুলো চাকমা ভাষায় “বারমাস/বারমাচ্” হিসেবে পরিচিত। “বারমাস” চাকমা সাহিত্যে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ধারা। বাংলা মধ্য যুগের কাব্য পাঠের মাধ্যমে চাকমা কাব্য রস পিপাসুগণ চাকমা সমাজেও এর প্রচলন জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বলে মনে হয়। মৌখিক এবং লিখিত দু’ভাবে চাকমা “বারমাস” গুলোর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত দিক থেকে বিবেচনায় আনলেও দেখা যায় যে চাকমা বারমাসগুলোতে বাংলা ভাষার প্রভাব রয়েছে। অবশ্য চাকমা কাব্যরসিকগণ এগুলিতে চাকমা শব্দ মিশ্রিত করে পাঠকগণের মনোবাসনা পূরণে সচেষ্ট থেকেছেন। চাকমা কবিদের রচিত “বারমাস” পাঠে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন কাব্য এবং পুঁথি চাকমা সমাজে এক সময় যথেষ্ট চর্চা এবং পঠিত হত। প্রসঙ্গত অজ্ঞাত এক চাকমা কবির রচিত “রাম বারমাস” এ কথাটির যথার্থতা যেন আরও একবার প্রতিধ্বনিত করে তুলে। তাছাড়া মধ্যযুগের নানা বাংলা পুঁথি চাকমা সমাজে এক সময় যথেষ্ট সমাদৃত ছিল বলে মনে হয়। ১৭৯৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল ফ্রান্সিস বুকানন তাঁর ভ্রমণের এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রেইংখ্যং বাক স্থানে এক চাকমা গ্রামে এসে হাজির হন। তিনি সেখানে এক বৌদ্ধ শ্রমণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। [আসলে ফ্রান্সিস বুকানন একজন বৌদ্ধ শ্রমণ নয় একজন চাকমা লুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুর আগমন ঘটে চাকমারাণী (১৮৩২-১৮৭৩)-র পরবর্তী সময়ে। একজন চাকমা লুরীর সে সময়ে চাকমা লিপিতে “আগর তারা” বা অন্য কোন পুঁথি পাঠ করার কথা।] কিন্তু বুকানন তাঁকে এক বাংলা পুঁথি পাঠ করতে দেখতে পেয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বুকানন তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে- He was reading a book in the Bengalese character, and on inquiry I found, that the man, except a few words, understood no other language (Page-104). ফ্রান্সিস বুকাননের সাক্ষাৎ লাভ করা উক্ত চাকমা লুরী বাংলায় ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার কথা নয়। কারণ চাকমারাণী কালিন্দীর প্রচেষ্টায় তাঁর মৃত্যুর পর “খাদুওয়াং” নামক পুস্তকের বাংলানুবাদ “বৌদ্ধরঞ্জিকা” হিসেবে প্রকাশিত



হয় ১৮৯০ সালে। “বৌদ্ধ রঞ্জিকা”র আগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। অনেকে এটিকে বাংলায় প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন। এ থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে বুকাননের সাক্ষাৎ লাভ করা উক্ত লুরী সত্যি সত্যি যদি বাংলায় কোন বই পাঠ করতে থাকেন তা হলে সেটা কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, মধ্য যুগীয় কোন বাংলা পুঁথিই হয়তো পাঠ করতেছিলেন। তাই যদি হয়, তবে তৎকালীন চাকমা সমাজে বাংলা পুঁথির এত কদর না থাকলে বুকানন কোনদিনই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতেন না। এভাবে হয়তো মধ্য যুগীয় বাংলা পুঁথির পঠনের মাধ্যমে চাকমা কাব্যরস পিপাসুগণ চাকমা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত “বারমাস” শাখাটিরও উদ্ভব ঘটান কিনা তা গবেষণার বিষয়। বিদ্যাসুন্দর, গোরক্ষবিজয়, রতিশাস্ত্র ইত্যাদি বাংলা পুঁথির চাকমা বর্ণে অনুলিখন থেকে এ ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়। এক সময় “বারমাস” শাখাটি চাকমা সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে উদ্ভব ঘটে নানা “বারমাস” বা বারমাসীর।

## ২

চাকমা বারমাসী সাহিত্য ধারায় “মা-বাব’ বারমাস” একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। অন্য বারমাসীগুলোতে সচরাচর দেখা যায় যে, কোন নায়িকার মাসওয়ারী সুখ-দুঃখের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে কিন্তু মা-বাবের বারমাসে সেরূপ কোন নায়িকা নেই। এত মাসওয়ারী বর্ণিত হয়েছে এক অনাথি, অসহায় পিতৃ-মাতৃহারা বালকের দুঃখের বিবরণ যা পাঠে পাঠকগণ হৃদয় গভীরে বেদনা অনুভব না করে থাকতে পারেন না। নানাদিক বিশ্লেষণে রচনাটি ত্রুটিমুক্ত না হলেও মৌলিক রচনা হিসাবে গণ্য করা যায়। যতদূর জানা যায়, প্রথম অবস্থায় এটি মৌখিক ভাবে কোন রাখাল বালক কর্তৃক গীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কেউ বোধহয় এটির লিখিতরূপ দেন। বারমাসটি সংগ্রহকালে আমাকে মানেক চন্দ্র (বৈদ্য) কর্তৃক রচিত হয়েছিল বলে তথ্য দেয়া হয়েছে। মনে হয়, মানেক চন্দ্র বৈদ্য রাখাল বালকের মুখ থেকে শুনে এটি লিখিতরূপ দিয়েছিলেন। মূল লিখিতরূপ চাকমা লিপিতে ছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ বারমাসটি ১৮০০ সালের শেষার্ধের বা ১৯০০ সালের প্রথম দশকের রচনা বলে অনুমিত হয়।

এক সময় কারর কারর কাছে যেহেতু এটি অনাথ, অসহায় ও পিতৃ-মাতৃহারা সন্তানের বিলাপগীতি, তাই পিতামাতা জীবিত থাকা অবস্থায় এটি পাঠ করা অমঙ্গলজনক কাজ হিসেবে বিবেচিত হত। স্মরণযোগ্য চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যেও চাকমাকবির রচিত “মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস)-এর অনুরূপ “এতিমের বিলাপ” নামে এক বিষাদ গাঁথার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু দুটি রচনা তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, দুটি রচনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি লাইন ব্যতীত আদৌ কোন মিল নেই। যে সামান্য সাদৃশ্যটুকু পাওয়া যায় নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

আহারে দুর্লভ মা-বাপ কিনা ভাবম তোরে  
তোমার না দুর্লভ বাদু সঁপি গেলা কারে  
যদি সে থাইকতারে মা-বাপ দুয়ারে বসিয়া  
সব দুঃখ পাশরিতাম মা-বাপরে দেখিয়া।  
চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য- ৪ পৃষ্ঠা

যদি মা-বাপ ঘরে থাকত আমার লাগিয়া  
সকল দুঃখ পাশরিদুং মা-বাপের দেখিয়া  
[সংগৃহীত মা-বাব’ বারমাস]

এ রকম সামান্য মিল ছাড়া আর অন্য কোথাও মিল দেখা যায়না। তাছাড়া মানেক চন্দ্র বৈদ্যের রচনাটি প্রথমটির তুলনায় অনেক দীর্ঘ। “মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস) রচনাটির প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য প্রদান করেছেন দীঘিনালা সদর থানা পাড়া নিবাসী শ্রী মঙ্গল মোহন চাকমা।

### ৩

“মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস)-এর দুটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে। একটি বাংলা বর্ণে এবং অন্যটি চাকমা হরফে লেখা। বাংলা বর্ণে পাঠটি সংগ্রহ কালে শ্রী মঙ্গল মোহন চাকমা আমাকে জানান, মূল বারমাসটি চাকমা বর্ণে লিখিত ছিল এবং পড়ার সুবিধার্থে তিনি এটি বাংলা বর্ণে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি আমাকে এও জানান যে, “মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস) মানেক চন্দ্র বৈদ্য রচনা করেছেন। চাকমা বর্ণে লিখিত বারমাসটির পাঠ মধ্য

বোয়ালখালী নিবাসী এলাকার অত্যন্ত পরিচিত ওঝাবুড়ী সোনাই মা থেকে সংগ্রহ করেছি। তিনি এটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি। সোনাইমার কাছ থেকে আরও কয়েকটি বারমাসের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এ থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চাকমা সমাজে বারমাসগুলো মহিলাদের কাছেও সমানভাবে সমাদৃত ছিল। অনেকে এই বারমাসটি ধর্মধন পন্ডিতের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এ উক্তির সত্যতার সমর্থনে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

“মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস)-টির দুটি পাণ্ডুলিপির পাঠ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দুটির মধ্যে মূলভাবের মোটামুটি মিল থাকলেও বাক্য বিন্যাসের মধ্যে তেমন একটা মিল নেই। তবে পর্যালোচনা করে, বাংলা বর্ণে প্রাপ্ত “মা-বাব’ বারমাস” (মা-বাপের বারমাস)-টির পাঠ অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। পাঠকগণের সুবিধার্থে দুটো পাঠ থেকে সাজিয়ে এখানে বারমাসটির রূপ দেয়া হল।

## ৪

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে এবং অনুকরণে চাকমা বারমাসীগুলো উদ্ভব ও প্রসার লাভ করলেও চাকমা বারমাসীগুলোর স্বাভাবিকতা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বারমাসীগুলোতে জুম নির্ভর চাকমা সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিকাশের চিত্র পাওয়া যায়। জুম নির্ভর চাকমা সমাজে শিক্ষা ও বাংলা ভাষা বিস্তৃতির সাথে সাথে চাকমা বারমাসীগুলো চাকমা সমাজে জীবন ঘনিষ্ঠ কোন আখ্যান বা ঘটনা নিয়ে উদ্ভব ঘটে এবং চাকমা কাব্যরস পিপাসুগণের মাধ্যমে তার প্রসার ঘটে। এই আখ্যান বা ঘটনাগুলোর জীবন ঘনিষ্ঠতা হেতু বরাবরই সাধারণ মানুষের মনে ঠাঁই নিতে সক্ষম হয়। সাধারণ মানুষ নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা খুঁজে পায় এ জীবন ঘনিষ্ঠ বারমাসীগুলোতে। লক্ষণীয়, চাকমা কাব্য রসপিপাসু বারমাস রচয়িতাগণ তাদের বারমাসীর উপজীব্য বাছাইয়ে বরাবরই কোন নারীর আখ্যান বা ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন। সেই বিনোদন মাধ্যমহীন অভাবের যুগে জীবন ঘনিষ্ঠ এই আখ্যান বা কাব্যরস মিশ্রিত বারমাসগুলোর প্রতি কমবেশী সব বয়সের মানুষের আকর্ষণ এবং কদর থাকা স্বাভাবিক। ফলে চাকমা বারমাসীগুলো পরবর্তীকালে খুঁজে পায় টিকে থাকার মত প্রাণস্পন্দন-গতি-নির্যাস। ধারণা করা

হয়, পূর্ব থেকেই মৌখিকভাবে নর-নারীর সুখ-দুঃখের বর্ণনা সম্বলিত লোকসাহিত্য চাকমা জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় ছিল। এতে চাকমা উভাগীতের সুরের প্রাধান্য থাকত। এতে আরো ছিল জুম নির্ভর চাকমা সমাজের নির্জন পাহাড় ঘেরা ভৌগলিক পরিবেশের হৃদয়ের গভীরের ভাষা প্রকাশের সুস্পষ্ট এক সহজ সরল উচ্চারণ। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও বারমাসীর প্রভাবে এ লোকসাহিত্য থেকে উভাগীতের প্রভাবটি ক্ষীণ হতে থাকে এবং তদস্থলে কোথাও কোথাও স্থান করে নেয় পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালীছন্দ ও মাসওয়ারী বিবরণ সম্পন্ন সুখ-দুঃখের আখ্যান। এভাবে সম্ভবত গড়ে ওঠে চাকমা বারমাসীগুলো। তান্যাবী বারমাসীতে দেখা যায়, তান্যাবীর মাসওয়ারী সুখ-দুঃখের কোন বিবরণ নেই। চাকমা উভাগীদের সুরের প্রভাবও এতে সুস্পষ্ট। তান্যাবী বারমাসটি জুম নির্ভর চাকমা সমাজের অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ। এর প্রতিটি ছন্দে রয়েছে পাহাড়ঘেরা বন্ধুর ভৌগলিক পরিবেশের চাকমা জনজীবনের হতাশা, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। তান্যাবী বারমাসটি তান্যাবী গীদ বা পালা হিসেবেও সুপরিচিত। অনেকটা এভাবেই বারমাসীগুলো চাকমাদের মননে পাকাপোক্ত আসন গড়ে বসে। নিচে এ লেখার জন্য সংগৃহীত “মা-বাব’ বারমাস” বা “মা-বাবর বারমাস”- বাংলা বর্ণে পাঠক সাধারণের জন্য লিপিবদ্ধ করা হলো-

মা-বাব’ বারমাস  
(মাতৃ-পিতৃহারা শিশুর বিলাপ)

যে গেব্ সর্গপুরি তে যেব ॥

বন্দনা :

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পুচিম করি নিবেদন  
মনি রিসি ধরিয়া চরণ  
অঝা গুরু মাতাপিত্য আর গ্যাতিগণ  
তাকারে বন্দনা মুই ধরিয়া চরণ।  
শুন শুন সর্বজন শুন দিয়া মন  
একনে কয়া দিব দুক্ক বিবরণ।

জরম্ মাত্র অয়া আমি কি পাব করিলুং  
ছোটকালে মাতৃ-পিতৃ আমি হারাইলুং ।  
আহাই বিধি দুষ্ক দিলে কবালে লিখিয়া  
সেই দুষ্ক পাই আমি এইকালে ভুগিয়া ।

প্রভু নিদয়া করিলে শিশুকালে

সেই দুষ্ক না পাইলুং সুষ্ক এবেল আমার কবালে লিগন ।

আহাই আমার কবালে লেঘা, মুর কবালে লিগন

আহাই প্রভু তুমি বাদে নাই কুনজন্ ।

তমারি লীলা খেলা তুমি মহেশ্বর ।

কর্মদুসে সেই বিধি আমি সেই সকল্

মুর্ মত্ নাই যে জন আমার করম্ দুসে এই দুষ্ক পাই যে,

শুন মুর দয়াবান কবালে দুষ্ক আমার কন্দান ন যায়

বিনা দুসে দুষ্ক সীমা নাই ।

পুরব্ পুচিম সীনান্তর বারমাস কর আলাপন

অ মা সরসস্তী কনের উপর

বারমাস জগাই দিবে অক্যরে অক্কর ।

[অথ ত্রিপদী কথাটি লেখা থাকলেও ত্রিপদী ছন্দে বারমাসের  
বর্ণনা পাওয়া যায়নি । সংগ্রহটিতে মাসওয়ারী বর্ণনা ছিল ।]

## ১

বৈশাখ মাসেত্ত মাবাপ পত্তম বছর,

তোমার লাগিয়া মাবাপ অঙ্গে জর জর ।

ভাগ্যফলে মুই অলুং মায়ের উদরে ,

দশমাসে দশদিনে ভমিস্তে পড়িলুং ।

কদ্ যতনে পালিল কৃষ্ণ মাই,

দয়া পালি কুলে তুলি যতন করিল মাই ।

দেবাইয়ে করিল কালা উত্তরের কোণে,

মাও নাই বাপও নাই দাগি নিব কনে ।

আহইরে দারুণ মাবাপ আমারে ছাড়িলা,

নাবালক শিশুপুত্র করে গজাই দিলা ।  
কিয়ে দেগাই লাধি গুজ কিয়ে দেগাই বারি,  
আহাই দারুণ মাবাপ কত দুক্ক সহি ।

## ২

জেটল মাসেত্ত মাবাপ গাছে পাকে আম  
গলায় কলসি বান্দি জলে দিদুং ঝাম ।  
পিতৃমাতৃহীন কি পাবে অইল মর  
পুত্র কুলে লয়া মাই দুদ দিয়া পালাইল ।  
সেই পুত্র ফেলাই গেল বিপদ সাগরে  
মাইয়ের দারুণ দুক্ক কয়ই না যাই ।  
পুত্র পালাইলে মাবাপ কদ দুক্ক পাই,  
আ আইরেই দারুণ মাবাপ কুথায় গেলে ছাড়িয়া,  
কদ দুক্ক পাই আমি মা বাপ লাগিয়া ।  
কিয়ে দেগাই লাধি গুজ কিয়ে দেগাই বারি,  
মাবাপ ছাড়া পুত্র আমি কনে লইব কাড়ি ।  
যদি ঘরে থাকত মাবাপ দুয়ারেতে বসিয়া  
সগল দুক্ক পাশরিদুং মাবাপ দেখিয়া ।  
যদি মাবাপ ঘরে থাইত আমফল পারিদিত  
আহাইরে দারুণ মাবাপ কুথায় ছাড়ি গেলা ।  
নাবালক শিশুপুত্র করে গজাই দিলা,  
মাও নাই বাপও নাই কুনজন,  
বিধিয়ে দিয়েছে মুরে কবালের লিগন ।  
আদকালি বাজিলেক্ক পুলিলেক্ক যাই,  
করম লেগা কনদিন ন ভুজিলে ন যায় ।  
আহাইরে দারুণ বিধি কত দিবে দুক্ক  
ছোটকালে না দেখিলুং মাবাপের মুখ ।

আষাঢ় মাসেত্ত মাবাপ আল্যা বানে এল্ ।  
 যদি থাকিত মাবাপ কনে দিদ গেল্ ।  
 যদি থাকিত মুর মাবাপ ঘরেত্তে বসিয়া,  
 সগল দুক্ক পাশরিদুং মাবাপ দেখিয়া ।  
 মাবাপ যদি থাকিত খুজি অইত্ মন্ ।  
 মাবাপ না থাকিলে পুত্র বিফল্লে জীবন ।  
 চন্দ্রহীন রাত্রি যেন সব অন্ধকার,  
 মাবাপ না থাকিলে সেই সব প্রকার ।  
 ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে গ্যাতিগণ ।  
 নাবালক শিশুপুত্র মাবাপ গেলা সন্নগপুরী  
 মাবাপর লাগিয়া আমি কান্দি কান্দি মরি ।  
 কান্দিতে কান্দিতে মাবাপ না পাইলুং দেখা ।  
 মাও নাই বাপও নাই নাই কুন জন,  
 না জানি ভুলিয়া মুরে মারিছে বর্ষায়ে কলম ।  
 দৈবের নিরকন্দ কভু খন্ডাতে কে পারে  
 বিফলে জরম্ আইলুং ভুবন মাঝারে ।

শ্রাবণ মাসেত্ত মাবাপ খালে নালে পানি,  
 কি কইব দুক্কের কথা আমার নয়নজল পানি ।  
 নাবালক শিশুপুত্র কেন পাশারিলে,  
 মা বাপ কারণে পুত্র নিশ্চয়ই মরিবে ।  
 আহাই দারুণ মাবাপ গেলারে ছাড়িয়া,  
 রাত্তিদিন কান্দি আমি তমার লাগিয়া ।  
 শ্রাবণ মাসেত্তে মাবাপ ধানে ধরে থুর,  
 আহাইরে দারুণ মাবাপ আমারে করিলে নিঠুর ।  
 নিঠুর করিলা মাবাপ আমারে ছাড়িলা,

সরগপুরে গেলা মাবাপ নিরালে রহিলা,  
যদি ঘরে থাকিত মাবাপ সুকশান্ত মনে,  
আহাইরে দারুণ মাবাপ অনু দিব কনে ।  
সরগপুরে গেলা মাবাপ আমারে ছাড়ি,  
অমাবশ্যা নিশিরাত্রি অতিঘুর করি ।  
যমের যাতনা পাই মাবাপ ভাবিয়া,  
বাপে যদি কামে যায় পুত্র আরা দিয়া ।  
কামের সুরন্ত করি যদ আছে ঘরে,  
বাপ দেখি শিশুপুত্র হাস্যরঙ্গ করে ।  
মায়ের কোলেতে বসি গলা বেড়াই ধরে ।

## ৫

ভাদ্রল মাসেত্ত মাবাপ ধানে দরে পাক,  
কুথায় গেলে পাইব আমি মাবাপরে লাক ।  
কিয়ে কাবে ধান কিয়ে বা কান্তন,  
মাবাপ নাইকো আমার নাই আর বোন ।  
কুথায় গেলে বিদ্ধ মাবাপ কুথায় গেলে ছাড়িয়া,  
রাতি দিনে কান্দি আমি মাবাপ লাগিয়া ।  
আহাইরে দারুণ মাবাপ কুথায় ছাড়ি গেলা  
নাবালক শিশুপুত্র কারে গজাই দিলা ।  
প্রভাত অইলে মাবাপ সূর্য উদয় হয়,  
তমার লাগিয়া মাবাপ কান্দে যে হৃদয় ।  
যদি থাকিত মুর মাবাপ ঘরেতে বসিয়া,  
সগল দুক্ক পাশরিদুং মাবাপ দেখিয়া ।  
যদি মাবাপ ঘরেতে থাকিত খুজী অইদ্ মন্  
পাবিস্ত শরীল ছাড়ি না যায়ে জীবন ।



আঝিন মাসেত্ত মাৰাপ বৰ্ষা অইল শেষ,  
 তমার লাগিয়া আমি ভ্রমি নানা দেস ।  
 দেশে দেশে ভ্রমিলাম পাই নানান দুখ  
 কুথায় গেলে দেগি পাই মাৰাপের মুখ,  
 আহাই দারুণ বিধি কি করিলে মূরে  
 নানান দেসে বেড়াইলুং বৈরাগীর বেশ ধরে,  
 মাৰাপর দারুণ জালাই সয়ন না যায়,  
 নানা সংসার বেড়াইলুং মাৰাপ বিনে নাই ।  
 এবেল আমি বুজিলাম মাৰাপের ধন,  
 কি করিব সনা রূপ্বা কি করিব ধন ।

কাণ্ডিক মাসেত্ত মাৰাপ ইনন্দ প্রবেশ,  
 আহাইরে দারুণ মাৰাপ কুথায় ছাড়ি গেলা ।  
 শয়নে সপ্ননে দেখি জাগিলেক নাই,  
 এমন দারুণ মাৰাপ মূরে ছাড়ি যায় ।  
 ত্রিভুবনে বেড়াই চাইলুং মাৰাপ সমান না পাইলুং,  
 নানান সংসার বেড়াই চাইলুং মাৰাপ সমান নাই,  
 এমন দারুণ মাৰাপ কুথায় গেলে পাই,  
 এমন দুল্লব মাৰাপ আমারে ছাড়িলা,  
 নাবালক শিশুপুত্র কারে গজাই দিলা ।

মায়াঃ। মাসেস্তু মাবাপ শীতের তাড়না,  
 ১০ করিব ধনের আশা কি করিব সনা ।  
 মায়াঃই দারুণ মাবাপ কুথায় গেলে ছাড়িলা,  
 ১১ দিনে কান্দি আমি তুমার লাগিয়া ।  
 মায়াঃও না বুজে মন উদে জলি জলি,  
 ১২ মাবাপ লাগি আমি কান্দিতে মরি ।  
 ১৩ দিব বাদের বাদা কনে দিব পানি,  
 ১৪ মুরে করিব দয়া পরের জননী ।  
 ১৫ এখানে বেড়েই চেলুং মাবাপ বিনে নাই,  
 ১৬ সেমত দারুণ মাবাপ কুথায় গেলে পাই ।

পুণ্ড্র মাসেস্তু মাবাপ শীতে কাবে বুক,  
 ১৭ দুসে বিধাতাইয়ে করিল বিমুখ ।  
 মাই নাই বাব নাই নাই কুনজন,  
 ১৮ করিব সনারূপা মানেক কান্জন ।  
 সগল তিত্ত ভমিলাম আর गया কাশি  
 দারুণ মাবাপ জালায় (গলায়) দিম মুঠ ফাসি)  
 বৈরাগির বেশ ধরি বিক্ক্যা মাগি খাই,  
 ১৯ কুথায় গেলে বিদ্ধ মাবাপ কুথায় গেলে পাই ।  
 ২০ দিবানিশি ভাবনা আমার কি করিতে পারি,  
 ২১ মৃতের অগ্নির মত জলি জলি মরি ।  
 এমন দুহুভ মাবাপ আমারে ছাড়িলা  
 ২২ নাবালক শিশুপুত্র কারে গজাই দিলা ।  
 ২৩ দশমাস দশদিন গর্বেতে রাখিলা,  
 ২৪ শিশুকালে কেন মাবাপ আমারে ছাড়িলা  
 ২৫ কিয়ে দেগই লাদিগুজ কিয়ে দেগই বারি  
 ২৬ মাবাহারা পুত্র আমি কনে নিব কাড়ি ।  
 ২৭ মাবাপ দারুণ দুকক সয়নু না জাই,  
 ২৮ করম্ দুস্বে দিল দুক্ক দারুণ বিধাতাই ।

## ১০

মাগল্প মাসেত্ত মাবাপ শীতে কাবে বুক,  
জনম ভরি ন দেলুং মাবাপের মুখ ।  
আ আইরেই দারুণ দুক্ক সয়ন না যাই,  
কি করিব কুথায় যাইব না দেগি উপায় ।  
কবালে লিখন্ন আমার কি অইব মুর,  
জনমভরি না জানিলুং মাবাপর দুন্নসার ।  
আহাইরেই দারুণ বিধি কি করিলা মুরে,  
পুর্ব জরমে পাব্ করি এলুং সংসারে ।  
মাত্‌হিন্ন পিত্‌হিন্ন আমি সর্ব লুগে কয়,  
সেই কারণে দিল দুক্‌খ দারুণ বিধাতায় ।  
পত্‌র ফুরি রৌদ্র পড়ে বিক্ক ন দেয় ছায়া,  
পত্‌রহিনি রৌদ্র আসে আমার করম দুসে ।  
এই মতে দুক্ক আমি দুই পাই,  
মাবাপর্ লাগিয়া আমি কান্দি কান্দি বেড়াই ।

## ১১

ফালগুন মাসেত্ত মাবাপ বসন্ত দিল প্রবেশ,  
পশু পক্কী বেড়াই নানা রঙে .....  
কুথায় গেলা দুল্লভ মাবাপ দেগই দরশন,  
দরশন পাইয়া মাবাপ থির অব মন ।  
দিবানিশি ভাবনা আমার বুদ্ধি নাই আর,  
বার মাজ পাইদুং সুক মুই ভুবন মাঝার ।  
আহাইরে দারুণ বিধি ভাঙ্গিল মোর কবাল,  
এই জীবনে মুর আশা নাই আর,  
বারমাজ পাইদুং সুক ভুবন মাঝার ।  
দিবানিশি কান্দি মাবাপ মন অইল পাগল,  
মাবাপহীন্ পুত্‌র আমি চোকে পড়ে জল ।  
জল দিয়ে পাগল অইদুং জানিবা অন্তরে,  
গ্যাতি বন্ধু ভ্রাতীগণ কেওয়ই ন চাই মুরে ।

গেল মাসেস্ত মাবাপ চঞ্চল অইল মন,  
 শরীল আন্দার অয়া দাগে ঘনে ঘন ।  
 এক তলে গিয়েছিলুং বিক ন-দে ছায়া  
 মুর মাবাপ ঘরে নাই কনে করিব দয়া ।  
 একেই দিব গদাবারি কিয়ে দিব লাধি  
 আমারে ছাড়িয়া মাবাপ কান্দি কান্দি মরি ।  
 শরণপূরে গেলা মাবাপ নিরালে রহিলা,  
 দুক দিলা মুর মাবাপ কারে গজাই দিলা ।  
 আদি থাকিস্ত মুর মাবাপ খুজি অইদ মন,  
 মাবাপ না দেগিলে পুত্র বিফলে জীবন ।  
 সেই মতে কান্দি আমি মাবাপ না পাই দরশন,  
 তমার লাগিয়া আমি নিচ্চইয়ে আনিব মরন ।  
 শয়নেস্তে সঙ্গন দেগি ঘোর রাত্রিকালে,  
 শয়নে চেতন অইলে না দেখি নয়নে ।  
 আরমাস বয়ে গেল না পুরাইল আশ  
 অতি দুকে জরাইনু মাবাপ বারমাস ।

### তথ্য-নির্দেশ :

- ১) Francis Buchanan in Sontheast Bengal (1798) edt. by Willem Van Schendel, 1992.
- ২) চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য- ওহীদুল আলম, ১৯৬৩, চট্টগ্রাম
- ৩) মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ- আহমদ শরীফ সংকলিত বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৬৯
- ৪) নির্বাচিত রচনা- আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পদনা ভূঁইয়া ইকবাল
- ৫) বাংলা সাহিত্যের কথা (২য়)- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- ৬) লোক সাহিত্য- অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী
- ৭) থিয়েটার স্টাডিজ, নাটক নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় জুন ২০০১  
(চাকমা নৃগোষ্ঠীনাট্য : সান্দবীর বারমাসী- আফসার আহমদ, পৃষ্ঠা ১৩-৬৮)
- ৮) দিদাস কালোস সংখ্যা-১, আষাঢ় ১৪০৮ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়  
(চাকমা বারমাসী আখ্যানে সমাজ ও মানসভাবনা- আফসার আহমদ, পৃষ্ঠা ৭-২৭)

চাকমা কবিতা

## যেন ফিরি এযঙ

অং ছাইন চাক

পুঝর ন' গরিচ এ মাদিরে কদক কোচ পাং  
যুগ যুগ এ দেজত যেন ফিরি এযঙ ।  
সাপু কাজলং বরগাঙ' পারে পারে  
আম কাণ্ডোল গাজ' তলে ।  
কৈচ্যাবন' বুব' সেরে সেরে  
চিম্বুক ফুরমোন মুরায় মুরায়  
চিগোন দাঙর পেইক সাজি  
এ দেজত যুগ যুগ যেন ফিরি এযঙ ।

ইজে-মাচ কাঙারা তগানাত, জুম' ছরায় ছরায়  
পেরাউন দাভানাত জুম' লেজায় লেজায়—  
জুম' লেজাত সত্রং ফুল কুরানাত বেইন্যামায়  
জুমোত কবরক ধান কাবানাত রোদমায়  
যুগ যুগ ইয়ত মুই যেন ফিরি এযঙ ।

রু-ব রঙর জুন' পহুরত শ্রাবণ মেঘ সমারি  
দেবা পেরাগ ঝিমিলানি অই যেন থাং জাগি  
ফুলর তুমবাস অই যুগ যুগ এ দেজত  
যেন ফিরি এযঙ । ।

## অনুবাদ : যেন ফিরে আসি

প্রশ্ন করো না এ মাটিকে কত ভালবাসি ?  
যুগে যুগে এ মাটিতেই যেন ফিরে আসি ।  
শজ্জ, কাসালং, কর্ণফুলীর পারে পারে  
আম কাঁঠালের তলে  
কাঁশবনের ঝাড়ে ঝাড়ে  
চিম্বুক ফুরামোন পাহাড়ে পাহাড়ে  
পাখি হয়ে ফিরি যেন উড়ে উড়ে ।

মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি খুঁজবো ছোট নদীতে  
জুম-পাহাড়ে খুঁজবো পাহাড়ী গাঁদা ভোরে  
রোদে কাটবো পাহাড়ী ধান কবরক  
যুগে যুগে যেন ফিরে আসি ।

রূপালী জোছনায় শ্রাবণ মেঘেরে ঘিরে  
বিজলীর চমকে যেন জেগে রই  
ফুলের সুবাসে যুগে যুগে হেথা যেন ফিরি ।

---

/ অং ছাইন চাক, উচ্চমান সহকারী, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

# উদাসী মন

পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

কোকিলের কুল টানে  
উদাসী এ মন,  
হেথা যাই, হোথা যাই  
তবুও কাটেনা কভুক্ষণ।

ফাগুনের ছোঁয়া লাগি  
দুলিয়া দুলিয়া উঠে হৃদ,  
কিসের খোঁজে দৃষ্টি ঘুরে  
ক্ষণিকে হারাই সম্বিত।

লুসাই হিলের আবছা চূড়া  
মন করে দিয়ে আনমনায়,  
বারে বারে ডেকে বলে-  
“ওরে, আমার কাছে আয়”

কল্ কল্ কল্ কল্  
কর্ণফুলী তুই চলছিস্ চল  
নেইতো সময় কিছু ভাবার  
চিন্তা তোর অবিরাম চলার।

গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরে  
কেবল উদাসী এ মন,  
রাজপুত্রর আসে না খোঁজে  
হৃদয়ে কেন রক্তক্ষরণ?

ঠোঁট রাঙাবে পান খেয়ে  
খিলখিলিয়ে হেসো পরীর নাচে গানে,  
দুঃখেরা যাবে উড়ে ফুৎকারে  
‘সতরং ফুলের’ ঝাঁকে, পাখির কলতানে।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা হয় মোচন  
আনন্দযজ্ঞে পেয়ে আমন্ত্রণ  
কৃতজ্ঞতা জানাতে কি দিই উপটোকন?  
“মুঞ্চতায় ভরে উঠুক তৃষিত দু’নয়ন”  
তাতেই খুশি হাস্যকল্লোলে বলে  
রূপকুমারী ফুরমোন।

# মাইসীর স্বপ্ন

শোভা ত্রিপুরা

মাইসী, মাইসী, ছোট তিন অক্ষরের  
ছোট্ট একটি নাম ।  
গলায় পুঁতির মালা পিঠের মাঝে  
জড়িয়ে থাকে নিত্য কাঠের বোঝা ।  
মাইসী, মাইসী প্রখর রোদ্রে—  
যেমে নেয়ে এগিয়ে চলে পাহাড় বেয়ে,  
পূরনে তার শতেক তালির হাতে—  
বোনা সেই কবেকার রিনাই;  
তালির উপর তালি ।  
মিষ্টি মুখে সলাজ হাসির মাঝে  
নিত্য ক্ষিধের জ্বালা,  
শতেক অভাব, পরনে তার  
জীর্ণ পুঁতির মালা; হাত পা কাঁপে,  
পেটের ভিতর অনল দহন  
কি যে, ভয়ংকর ।  
কেউ জানোনা, কেউ দেখেনা  
আগ্নেয়গিরির জ্বালা ।  
মাইসী-মাইসী গলায় যে  
তার জীর্ণ পুঁতির মালা ।  
পাঁচ ঢালা পথ, যন্ত্র দানব হুহু  
করে যায়, ছুটে যায় সামনে সগৌরবে;  
কত রূপান্তর হায়রে জীবন!  
বদলায়নি এই জীবন যে তার,  
নিত্য বনে যাওয়া,—  
বাঁশের বোঝার ভারে, নিত্য দিনই কাটে

কেউ দেখে না ফিরে ।  
এই পৃথিবীর বুকে, এমনি বেঁচে থাকা  
প্রতিদিনই লাকড়ী কাটা,  
এমনি উপোস থাকা ।  
সূর্য কখনো তীব্র দহন দিয়ে  
দেয় পুড়িয়ে, সোনার বরন গায়ে  
ফোস্কা পরে, ললাট বেয়ে  
ঝর ঝরিয়ে ঘাম যে ঝরে ।  
চলতে হবে এমনি করে সারা জীবন  
রোদে পুড়ে, জ্বলে ভিজ—  
ক্ষিধের জ্বালায় টলে-টলে ।  
সবুজ বনের, শ্যামলিমায় হলুদ  
রোদের ছোঁয়া ।  
মাইসী চলে, নেয়ে যেমে  
সভ্যতাকে প্রশ্ন করে,  
এই কি জীবন, বিশ্ব বিবেক  
কই তোমাদের ঘুম ভেঙ্গেছে নাকি ?  
মাইসী চলে এমন ভাবে  
কষ্টে জীবন গড়া ।  
একমুঠো ভাত, করতে যোগাড়  
মাইসী কপাল পোড়া ।



# ত্রিপুরা জনজীবনে তাদের বর্ষপঞ্জি ত্রিপুরাদের প্রভাব

## প্রভাংশ ত্রিপুরা

আমাদের এখানকার একটি জনগোষ্ঠি এবং সমৃদ্ধময় ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে ত্রিপুরাদের রয়েছে নিজস্ব একটি বর্ষপঞ্জিকা যার নাম “ত্রিপুরান্দ” সংক্ষেপে এটিকে ‘ত্রিং’ লিখা হয়।

‘ত্রিপুরান্দ’ বর্ষপঞ্জিকার প্রবর্তক হিসেবে ত্রিপুরা মহারাজা বীররাজ যুবারূপা হামতর ফাকে বলা হয়। আমাদের জানামতে ‘ত্রিপুরান্দ’ বর্ষপঞ্জিকা শকাব্দের ৩০শে চৈত্র বিষ্ণু সংক্রান্তিতে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বিষ্ণু সংক্রান্তিগ্ন অতি পূণ্যময় দিন বলে এ দিনের ‘ত্রিপুরান্দ’ বর্ষপঞ্জিকায় উৎসর্গ করা হয়েছিল বলে বিশ্বাস এবং এ কারণেই ত্রিপুরা জনজীবনে ‘বৈসু’ উৎসবকে প্রধান উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

‘ত্রিপুরান্দ’ শকান্দ থেকে ৫১২ বছরের পরবর্তীকালের এবং বঙ্গান্দ থেকে ৩ বছর এবং মগান্দ থেকে ৪৮ বছরের পূর্বকার। এটি সৌরবর্ষ ভিত্তিক একটি অন্দ। ‘ত্রিপুরান্দের’ ১২টি মাসের নাম যথাক্রমে— তালতুং, তালকারান, তালয়ুং, তালতুক, তালবাং, তালউমায়, তালউয়াং, তালরোং, তালরুং, তালহিং, তালন্নাং এবং তাললাং।

ত্রিপুরান্দের সাপ্তাহিক নাম যথাক্রমে— ককতিসাল, তাংসাল, চবাসাল, লেংখসাল, ম্রাংসাল, দুগুসাল এবং সংগ্রংসাল। বর্ণিত ১২টি মাস এবং সাপ্তাহিক দিনের নাম গ্রহ নক্ষত্রের— নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রের দৃশ্যমানতার উপর নির্ভর করে মাসিক দিনের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে ত্রিপুরান্দের কতিপয় উৎসব ও পূজাপার্বণের তিথি লগ্নসহ তাৎপর্য বর্ণনা করা হলো।

- ১। বৈসু উৎসব বৈসু ত্রিপুরান্দের তাললাং মাসের ৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসব ত্রিপুরান্দের প্রধান উৎসব। বৈসু উৎসবের তিনটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমতঃ তাললাং মাসের (শকাব্দের চৈত্র) ৩০ তারিখে ত্রিপুরান্দ বর্ষপঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়েছিল। কাজেই ৩০শে তাললাং ত্রিপুরান্দের প্রথম দিন। এটি বর্ষবরণের দিন। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণু সংক্রান্তি দিন অতিশয় পূণ্যময় দিন। ফলে

এ দিনটি সাধারণত দিনরাত্রি দৃশ্যমান এর আওতায় পড়ে না। তৃতীয়তঃ বৈসু উৎসব দিনগুলিতে গরিয়া নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। গরিয়া কর্ম ও প্রেমের দেবতা। কৃষিকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ত্রিপুরা জনগণ 'গরিয়া' নৃত্যোৎসব করে উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। বৈসু তিথি লগ্নে ত্রিপুরা জনগণ প্রয়াত পিতৃপুরুষদের স্মরণে পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় বংশ প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি পূজানুষ্ঠান করে থাকে। এর নাম 'সিমতুং'। সিমতুং নৃত্য খুবই হৃদয়গ্রাহী, আবেগময় এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সময় অবিবাহিত ত্রিপুরা নারীগণ স্রোতবাহী নদীতে মাঙ্গলিক প্রদীপ ভাসিয়ে থাকে। এর নামও হয় সিমতুং পূজা।

- ২। কের উৎসব প্রতিবছর ত্রিপুরাদের তালতুক মাসের (শকাব্দের শ্রাবণ) কৃষ্ণপক্ষের প্রথসপ্তাহে ও চবা (শনি ও মঙ্গল) দিনে কের পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কের পূজা উৎসব হয়ে থাকে। এটি একটি সার্বজনীন পূজা উৎসব।
- ৩। গোমতী পূজা উৎসব ত্রিপুরা রাজারা গোমতী নদীকে দুধ স্রোতরূপী মাতৃনদী হিসাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করে থাকে। গোমতী পার্বতী কন্যা 'ত্রিপুরা সুন্দরী' নামে নামাজিতা। গোমতী পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরাদের তালতুং (শকাব্দের জ্যেষ্ঠ) মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। গোমতী পূজা উৎসব করলে সর্ব পাপ ক্ষয় হয় এবং পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বলে ত্রিপুরা জনগণের বিশ্বাস।
- ৪। সিবরাই পূজা উৎসব ত্রিপুরাদের তালমাং (শকাব্দের ফাল্গুন) মাসের উত্তরায়ন চতুর্দশী তিথিতে সিবরাই পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রীতি কামনা করে চারি অভিষ্ট আশা যথাক্রমে মারী ভয় নিবারণ, অতুল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, ধর্মকর্ম সিদ্ধি এবং মোক্ষ লাভার্থে সিবরাই পূজা উৎসব করে থাকে।

৫। খার্চীপূজা উৎসব এটি ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের একটি পূজা উৎসব। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত আছে চতুর্দশ দেব মন্দির। পৃথিবীতে এরূপ চতুর্দশ দেব সমাহার মন্দির আর কোথাও নেই। প্রতিবছর ত্রিপুরাদের তালফুং (শকাব্দের আষাঢ়) মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে চতুর্দশ দেব মন্দিরে ৭ দিন ব্যাপী তীর্থ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্দিরে যে পূজানুষ্ঠান সম্পাদিত হয় তা ‘খার্চী পূজা’ উৎসব নামে নামাজিত হয়। খার্চী পূজা উৎসব চলাকালীন নিশিথে সে তান্ত্রিকাচারে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তার নাম ‘হজাগিরি।’ ‘হজা’ অর্থ হয় রাত্রি এবং ‘গিরি’ অর্থ ভয়ঙ্কর অর্থাৎ ভয়ঙ্কররাত্রি। সাধারণ মানুষ খার্চী পূজা অনুষ্ঠান করতে পারে না। রাজা, যশস্বী নরপতি, ভূপতি অর্থাৎ রাজন্যবর্গেরই কেবল মাত্র ‘খার্চী পূজা’ অনুষ্ঠান করার বিধিবিধান রয়েছে।

৬। হাবা উৎসব ‘হাবা’ শব্দের বাংলা অর্থ হয় কৃষি ‘হাবা’ পূজা মানে কৃষি পূজা। ত্রিপুরারা কৃষি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আগে ধরিত্রীকে আহ্বান করে একটি পূজা উৎসব করে থাকে। এর নাম ‘হাবা পূজা উৎসব’। ত্রিপুরা জনগণের বিশ্বাস সৃষ্টির সকল প্রকার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা খেলা ধরনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অতএব, স্তুতি করলে তাঁর আশীর্বাদে মানুষের ধন, জন ও অতুল ঐশ্বর্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আর এ কারণে হাবা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবনে জীবিকা প্রণালী ছিল অধিকাংশই জুম ভিত্তিক কৃষি নির্ভর জীবন। ত্রিপুরাদের তালফিং মাসে ত্রিপুরাগণ প্রথমত জুম ক্ষেত্র নির্বাচন করে থাকে। এজন্য তালফিং (শকাব্দের পৌষ) মাস থেকে তালফুং (অগ্রহায়ণ) মাস পর্যন্ত সময়কালকে ত্রিপুরা জনজীবনে ‘কৃষিবর্ষ’ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কৃষি বর্ষের প্রথম দিন সূচনা হয় তালফিং (পৌষ) মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে। শুক্লা দশমী তিথিতেই ত্রিপুরাগণ প্রথম জুম কাটার সূচনা করে এবং এ দিনেই প্রত্যেক জুম চাষী ‘হাবা’ পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে।

হাবা পূজা উৎসব দু'প্রকারে হয়ে থাকে। প্রথম পূজা অনুষ্ঠিত হয় ঘরের উঠানে উথেপ সাজিয়ে, তাতে মাস্তুলিক প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং বলি উৎসর্গ করে। দ্বিতীয় পূজা অনুষ্ঠিত হয় বনে। বন-পূজায় উৎসর্গকৃত বলির মাংস দিয়ে ভোজনানুষ্ঠানে যে পূজা করা হয় তার আরাধ্য দেবতার নাম ধরিণী। আবার বন-পূজার আরাধ্য দেবতার নাম বুড়াসা প্রকারান্তরে-দেবাদিদেব সিবরাই। ত্রিপুরা জনজীবনে বন পূজা এবং বনভোজনের রীতির আজও প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি পরিবারে 'হাবা' পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিধায় চারিদিকে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে জুমিয়াদের প্রতি ঘরে তালহিং মাসের শুক্লা দশমীর দিন অনেকটা বর্ষবরণ উৎসবের মত আমেজ সৃষ্টি হয়।

৭। রাজপূন্যাহ্ অতীতে ত্রিপুরা রাজারাদের রাজত্বকালে তালবুং (অগ্রহায়ণ) মাস থেকে তালউয়াং (কার্তিক) মাস পর্যন্ত সময়কালকে অর্থবছর বলে গণ্য করা হতো। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি নির্ভর। জুম ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত ফসল আহরিত হতো তালবাং (ভাদ্র) মাস থেকে তালউয়াং (কার্তিক) মাস পর্যন্ত। জুমচাষীরা জুম ক্ষেত্রে উৎপাদিত অর্থকরী ফসল যেমন তিল, কার্পাস, হলুদ, আদা, কচু, তৈলবীজ ও শস্য হাটে এনে বিক্রি করতো তালউয়াং মাসে। এতে প্রত্যেক কৃষকের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা বিরাজ করতো। এ মৌসুমে ত্রিপুরা মহারাজার অধীনস্থ সামন্ত রাজাগণ, সমাজপতিগণ, দফা প্রধানগণ, মৌজা প্রধানগণ এবং গ্রাম-প্রধানগণ কৃষি খাজনা উসুল করতেন। খাজনা উসুল উপলক্ষে 'পূন্যাহ্' আহ্বান করা হতো। এই পূন্যাহ্ অনুষ্ঠিত হতো ত্রিপুরাদের তালবুং (অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে।

৮। কাথারক উৎসব কাথারক উৎসবের বঙ্গার্থ হয় মাস্তুলিক উৎসব। এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর ত্রিপুরাদের তালউয়াং (শকাব্দের কার্তিক) মাসের শুক্লা নবমী এবং তালবুং (শকাব্দের অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্লা চতুদর্শী তিথিতে। পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি, মানসিক শান্তি, গ্রহশান্তি, দাম্পত্য শান্তি এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি কল্পে কাথারক পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজা উৎসবে যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তা 'মাস্তুলিক নৃত্য' নামে নামাঙ্কিত হয়। আজকাল এটি 'বোতল নৃত্য' হিসাবে অনেকের কাছে পরিচিত হচ্ছে।

৯। চুমলাই উৎসব চুমলাই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর ত্রিপুরাদেশের তালউমায় (শকাব্দের আশ্বিন) মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে। সাধারণতঃ জুম ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলা শেষ হলে বরকতের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা জনগণ যে নবান্ন উৎসব করে থাকে তা চুমলাই নামে নামাজিত হয় ইত্যাদি। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের মধ্যে এর প্রচলন লোপ পেলেও অন্যান্য ত্রিপুরাদের জনজীবনে ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকার প্রয়োগ ও প্রচলন আজও অটুট রয়েছে। যে সকল সংগঠন ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকার উৎকর্ষ সাধন, প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কাজ করেছে তা নিম্নরূপ :

- ১। ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন বৈসু সংকলন প্রকাশনা :  
১৪০০ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা।
- ২। ত্রিপুরা সনাতন কল্যাণ পরিষদ : ১৪০৪ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা।
- ৩। যামুক নাট্য গোষ্ঠী : ১৪০৭ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা।
- ৪। ত্রিপুরা স্টুডেন্ট'স ফোরাম : ১৪১১ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা  
১৪১৩ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা।

### ব্যক্তিগত উদ্যোগ :

শ্রী প্রভাংশু ত্রিপুরা : ১৩৯৫ ত্রিপুরাদ বর্ষপঞ্জিকা।

<p>শ্রী নির্মলেন্দু ত্রিপুরা শ্রী প্রভাংশু ত্রিপুরা</p>	}	যৌথ উদ্যোগে : ১৪০৩ ত্রিপুরাদ বর্ষ পঞ্জিকা।
---	---	--

---

[ জনাব প্রভাংশু ত্রিপুরা, মুখ্য প্রযোজক, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম। ]

## উসাই- এর প্রকাশিত বইয়ের মূল্যের তালিকা

নং	বইয়ের নাম	মূল্য	শতকরা ১৫% হারে কমিশন	শতকরা ১৫% হারে কমিশন বাদ দিয়ে মূল্য
১।	গিরিনির্ঝর ৪র্থ সংখ্যা	৩০/-	৪/৫০	২৫/৫০
২।	গিরিনির্ঝর ৫ম সংখ্যা	১৬/-	২/৪০	১৩/৬০
৩।	গিরিনির্ঝর ৬ষ্ঠ সংখ্যা	২৪/-	৩/৬০	২০/৪০
৪।	গিরিনির্ঝর ৭ম সংখ্যা	২৭/-	৪/০৫	২২/৯৫
৫।	গিরিনির্ঝর ৮ম সংখ্যা	৩৮/-	৫/৭০	৩২/৩০
৬।	চাকমা ভাষা শিক্ষার ১ম পাঠ	৩৫/-	৫/২৫	২৯/৭৫
৭।	ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার ১ম পাঠ	২৫/-	৩/৭৫	২১/২৫
৮।	মারমা ভাষা শিক্ষার ১ম পাঠ	২৫/-	৩/৭৫	২১/২৫
৯।	চাকমা পূজা পার্বণ	১৪/-	২/১০	১১/৯০
১০।	ত্রিপুরা পূজা পার্বণ	২৭/-	৪/০৫	২২/৯৫
১১।	চাকমা ভাষার শব্দকোষ	১০০/-	১৫/-	৮৫/-
১২।	ত্রিপুরা ভাষার অভিধান	৪৭/-	৭/০৫	৩৯/৯৫
১৩।	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা	৩০/-	৪/৫০	২৫/৫০
১৪।	উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা	১০০/-	১৫/-	৮৫/-
১৫।	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি	১২৫/-	১৮/৭৫	১০৬/২৫
১৬।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়	১৩০/-	১৯/৫০	১১০/৫০
১৭।	চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীবৃন্দ	১০০/=	১৫/-	৮৫/-
১৮।	বৈসাৰি '৯৬	৫০/-	৭/৫০	৪২/৫০
১৯।	বৈসাৰি '৯৮	২৫/-	৩/৭৫	২১/২৫
২০।	বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী	১০০/-	১৫/-	৮৫/-
২১।	চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি	৯০/-	১৩/৫০	৭৬/৫০
২২।	ত্রিপুরা রূপকথা	৬০/-	৯/-	৫৯/-
২৩।	বৈসাৰি '৯৯	৩০/-	৪/৫০	২৫/৫০
২৪।	চম্পক নগর সন্ধানেঃ বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি	১২০/-	১৮/-	১০২/-
২৫।	বৈসাৰি : ২০০০	৩০/-	৪/৫০	২৫/৫০
২৬।	চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা	৭০/-	১০/৫০	৫৯/৫০
২৭।	চাকমা রূপ কাহিনী	১১০/-	১৬/৫০	৯৩/৫০
২৮।	বৈসাৰিঃ ২০০১	৩০/-	৪/৫০	২৫/৫০
২৯।	চাকমা বার মাস ও ত্রিপুরা বার মাস	৬০/-		

# উসাই কৰ্তৃক আয়োজিত বিবু, সাধ্বাই, বৈসুক ২০০৩ অনুষ্ঠান পরিক্রমা



খেংগরং ও বাঁশী বাদনরত  
দুইজন শিল্পী

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী  
ঘিলা খেলা



মারমাদের ঐতিহ্যবাহী  
পানি খেলা

মারমাদের ঐতিহ্যবাহী  
পানি খেলা

